আমি এখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে

উদয়ন ঘোষ

উদয়ন ঘোষের এই রচনাটি দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি প্রকাশিত হয়েছিল যোগসূত্র, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সংখ্যায়। এবার প্রকাশিত হল দ্বিতীয় তথা শেষ অংশটি।

পঞ্চম অধ্যায়

এখনও পৃথিবী সূর্যে সুখী হয়ে রৌদ্রে অন্ধকারে ঘুরে যায়

বীর্যসংক্রান্ত সমস্যায় পড়ি প্রথম, মনে আছে ভালো ক্লাশ সেভেনের অ্যানুয়াল পরীক্ষা দেবার পর, শীতে। তখন থেকেই স্বরভঙ্গ আমার, আজও গেল না।

তখন সবে বিবেকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে। তখন বিবেকের গানের সুরের ছোঁয়াচ লাগত মনে, খুব। তার কোকিল-কণ্ঠী গীতশ্রী মেজদির দৌলতে, তখন থেকেই সঠিক সুরে গান গাইতে পারত সে। গলাও ছিল ভরাট। তবে ওর হাঁপানী ছিল বলে গলার স্বর কখনো চিকন, কখনো ভারি হত বেশ।

ওদের বাবা বাদে, বাড়ির আর সবারই গলা ভালোই ছিল। স্বরভঙ্গ ছিল না কারুর। বিবেকের মার গলা ছিল সর্বাপেক্ষা মোহময়ী। অনেকটাই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত। মিষ্টি তো বটেই, উপরন্তু প্যাসানেট। বিবাহের আগে ওঁরও নাকি গানের চর্চা ছিল ভালোই। বিবাহের পর ঐ চর্চায় ডাকঘরের ডেডলেটার-স্ট্যাম্প মেরেছিলেন ওঁর স্বামী, বিবেকের বাবা। তাঁর গলা ছিল বাজখাঁই। পোস্টমাস্টার ছিলেন। কম কথা বলতেন। বল্লে ঐ, অর্থাৎ বাজখাঁই।

না লিখে পারছি না যে, বিবেকের মার ঐ গলা শুনবার জন্য, অকারণ কথা বলতাম তাঁর সঙ্গে। ঐ ক্লাশ সেভেনে, বীর্যসংক্রান্ত সমস্যায় পড়ার আগেই, ঐ গলা শুনে, মাপ করবেন, ঐ গলা শুনে কেন যে যৌনতা জাগত আমার, আজও ভেবে পাই না। লতা মুঙ্গেশকরের গলা শুনলেও আমার যৌনতা জাগে অদ্যাপি। অদ্যাপি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনেও ঐ। তবে এই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে ঐ যৌনতা ছিল অম্নিপোটেন্ট। কেন অম্নিপোটেন্ট ব্যাখ্যা করতে পারব না। "আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে"...শুনলে, ঐ হত, ঐ অম্নিপোটেন্স জাগত।

কি আর বলব, বিবেকের মার চোখ দুটো ছিল অবিকল মেরিলিন মনরোর মত, আধ-বোজা। মায়াবী। অথচ আয়ত। এবং সাংকেন। ন্যাচারাল মাস্কারা ছিল ঐ কোলে। দেখতে ভুল হয়নি, বিশ্বাস করুন।

বিবেক তখনি গাইতো, "বল বল বল সবে/শতবীণা বেণুরবে/ভারত আবার জগৎ সভায়/শ্রেষ্ঠ আসন লবে/কর্মে মহান হবে/ধর্মে মহান হবে..."ইত্যাকার গানে, অথবা এর পাশাপাশি ছোঁয়াচে কোনো গানে ঐ 'বীর্য' কথাটা ছিল। আজ আর অবিকল মনে নেই।

ঐ বীর্য গান শুনে, বিবেককে একদা জানাই আমার বীর্য সমস্যা। স্খলিত বিন্দুর কথা। নিভৃতে। প্রকাশ্যে সে প্রথমে জানায়, গানের বীর্য আর আমার বীর্য এক কথা নয়। অর্থাৎ প্রথম বীর্যে কোনো সমস্যাই নেই, অর্জন করা যা সমস্যা, এবং ব্যক্ত করাই তার কর্ম; কিন্তু দ্বিতীয় বীর্যের সমস্যা সীমাহীন, তার সঞ্চয়, তার অপচয়ে বড়

হানাহানি। গানের বীর্য বা প্রথম বীর্য হল 'বীর' বিশেষণের বিশেষ্য রূপ। আর ঐ দ্বিতীয় বীর্য বা শরীরী বীর্য হল 'সিমেন', শরীরের সমস্ত কেমিকালের সারবস্তু, ভাইটাল ফোর্স, মরাল ফোর্স, শুক্র। প্রজননকর। বীজগুণান্বিত। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। প্রবহমান। ব্যক্তি-আশ্রয়ী হয়েও সে সমাজাশ্রয়ী।

বিবেক বরাবরই পড়াশুনোয় ভালো। আমার চেয়ে শতগুণ তার পড়াশুনো। তার পিতার দৌলতে নানা ডাকঘরে বদলি হতে হতে বিবেক শিখেছিল সেই সর্বশক্তিমান ইংরাজি। হিন্দীও শিখেছিল কাজ চালানোর মত। আমি যার 'হায়' অবধি জানি আর কোনো 'মতলব' জানি না। বার বার ঠাঁই বদলানোর জন্য ওরা ছিল বহতা পানি, অর্থাৎ নির্মলা। আর আমার ইংরেজি বরাবরই 'ক' অক্ষর গোমাংস। যতটুকু শিখেছি, তার ১৪ আনাই আনন্দময়ীর কৃপায়। বাকি দু আনা, বলা বাহুল্য, বিবেক দংশনে। ইংরেজি নিয়ে কম ঠাট্টা বিবেক আমাকে করেনি!

মনে আছে ভালো, আমি কত সোহাগ করে, একবার গর্বভরে বলেছিলাম, 'শূন্যে', বিবেকের ভুলে, 'শূন্যে' মূর্ধণ্য 'ণ' is uncorrect।

সঙ্গে সঙ্গে বিবেক দংশন করে, uncorrect is incorrect.

ঐ সুরু। বন্ধুসংসর্গে ইংরেজি শেখা। এখন বলতে দ্বিধা নেই, বন্ধুসংসর্গেই সব হয়। মানুষ অতলে তলিয়ে যায়, অথবা শীর্ষে ওঠে।

আমার বীর্যসংক্রান্ত সমস্যা শুনে, আভিধানিক ব্যাখ্যার পর, বিবেক জানায়, এই সমস্যা বয়ঃসন্ধির। বয়ঃসন্ধির ইংরেজি অব্দি শুনি, তখনি, adolescent, adjective, passing from childhood to maturity.

বলার পর, এক রবিবার, সে, বিবেক, আমাকে গোপালদার কাছে নিয়ে যায়। গোপালদা তখন আর. এস. এস. করেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কৃষ্ণনগরী সেনাপতি ছিলেন।

কত কী শিখেছিলাম তাঁর কাছে, বীর্যরক্ষা, স্বপ্নগুণ, নারী মাত্রই মা অথবা বোন। সিঁথিতে সিঁদুর থাকলে মা, না থাকলে বোন। বীর সাভারকরের গল্প। ছত্রপতি শিবাজীর গল্প। মহারাষ্ট্রের জীবনপ্রভাত। মুসলিম আনুকুল্যে রাজপুতদের জীবন-সন্ধ্যা।

"লাঠি তোমার দিন গিয়াছে"—এই বঙ্কিমী বাক্যে শোকবিহ্বল না হয়ে লাঠিখেলা শেখা ছিল সব শিক্ষার সেরা শিক্ষা। যতদূর মনে পড়ে, দেহের অঙ্গের বিভিন্ন অভিধা, নাম ইত্যাদি, শিখিয়েছিলেন, যথা, যতদূর স্মরণযোগ্য, তথা ঐ, অর্থাৎ তামেচা, বাহেরা, শির, কোটি, ভেন্ডার, হুল—শেষ অব্দি শত্রুর বীর্যেই আঘাত করা অথবা আপন বীর্যরক্ষা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবার মূলাধার।

রাত্রে শোবার আগে স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ। এও শিখিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমার অদ্যাপি উপাস্য। 'I Socialist' পড়ার পর আজও তিনি

আমার পাঠ্য। তাঁর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তো একপ্রকার আমার মাস্টার। যদিও ১৯৭০-এ তাঁকে চিনি। নকশালবাড়ির দাবানলের আলোয় এমন অনেকানেক বিপ্লবী চিন্তানায়কদের মুখ দেখি। উজ্জ্বল মুখাবয়ব সব। ঐ ভূপেন্দ্রীয় ভ্রাতৃত্বে 'বিবেকানন্দ' দেখলেই কেবল 'I Socialist'-এর মর্মোদ্ধার হয়। ১৯৭০-এ এও শিখি যে, বিবেকানন্দকে নরেন্দ্রনাথ হিসেবে দেখতে হবে। দেখতে হবে রামকৃষ্ণ মিশনারী কভার স্টোরির ইন-বিটুইন লাইনসে গিয়ে। ভায়া ভগিনী নিবেদিতা।

আর. এস. এস. কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে হিন্দু-মংক হিসেবে দেখাতো আমাকে।

এই হিন্দুত্ব আমার মন থেকে ধুয়ে মুছে যায় ১৯৪৮, ৩০ জানুয়ারি, গান্ধী-হত্যার পর।

এত দুঃসংবাদ দেয়ার মধ্যেও, মনে হচ্ছে, আমার কত সৌভাগ্য যে, *My Early Life* : M. K. Gandhi ছিল আমাদের ম্যাট্রিক র‍্যাপিড রিডার। গান্ধীজীর বাল্যলীলা। ছেলেবেলা। রবীন্দ্রনাথের চেয়েও যে ছেলেবেলা কষ্টিপাথরে যাচাই করা। এখন আমি বলতে বাধ্য কোনো কিশোরকে, বলা উচিৎ কোনো কিশোরের প্রতি আমার তিনটি উপদেশ, কার্যত চারটি : প্রথমত গান্ধীজীর ছেলেবেলা থেকে শেখো। দ্বিতীয়ত, একমাত্র গান্ধীজীর ছেলেবেলা থেকেই শেখো। তৃতীয়ত, ঐ গান্ধীজীর ছেলেবেলাকেই কেবলমাত্র অনুসরণ করো। শেষপর্যন্ত, ঐ গান্ধীজীকেই ফলো করো early life-এ। কেননা, তিনি, গান্ধীজী, ছেলেবেলায়, নিরামিশাষী রক্ষণশীল পরিবারভুক্ত হয়েও মাংস চেখে দেখেছিলেন। চুরি অব্দি করেছিলেন। বিড়িও খেয়েছিলেন। এখানেই মনে পড়ে, শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, আমার বন্ধু, যিনি ড্রাগের প্রকোপে ২/৩ বছর হল সুইসাইড করেছেন, তাঁর, বিড়ির প্রতি ঝোঁক ছিল খুব। পারতপক্ষে সিগারেট খেত না। বিড়ির সুখটানে জানাত, "মায়ের দেয়া শাদা সুতো মাথায় তুলে নেরে ভাই, দীন দুঃখিনী মা যে মোদের সিগারেট দেবার সাধ্য নাই"—এও সগর্বে হাইটোনে বলত, "Smoke Bidi only, be Indian, buy Indian Bidi, Even Gandhiji Smoked." হ্যাঁ, সিরিয়াস হলেই সে ইংরেজি বলত।

যা বলছিলাম, গান্ধীজীর কথা। ঐ মাংসভক্ষণ, ঐ চুরি, ঐ বিড়িপান—ইংলন্ডে মদ্যপান, নাচ, মহিলাসঙ্গ—সব কিছু চেখে, পিঁয়াজবিলাসী রামকৃষ্ণের মতই এ গালে পেঁয়াজ, ও গালে পেঁয়াজ দিয়ে, "ওঃ, আমার পেঁয়াজ খাওয়া হয়ে গেল রে হৃদে!" বলেই ক্ষান্ত দিয়েছিলেন ঐ মাংসভক্ষণ, ঐ চুরি, ঐ বিড়িপান, ঐ মদ্যপান, ঐ নাচ, আর ঐ মহিলাসঙ্গ।

এজন্যই তিনি, আমার অনুসরণ যোগ্য। আমিও তাঁর মতই ছাড়তে চাই, বিশ্বাস করুন, ছাড়তে চাই সিগারেট, মদ্যপান, নারীসঙ্গ (মাকে কেবল পেতে চাই—না বোন না, ওসব হঠকারিতায় আর নেই।) ছাড়তে চাই।

কতটা ছাড়তে পেরেছি, সেটা বড় কথা না, মানুষ কতটা ছাড়তে পারে, সেটাও বড় কথা না, বড় কথা হল, মানুষ কতটা ছাড়তে চায়, কেননা ও-সব মানুষকে শৃঙ্খলিত করে।

ভালোই জানি যে, freedom is the recognition of necessity, আমার প্রবৃত্তি আমাকে স্বাধীনতা দেয় না, আমার আসল প্রয়োজনকে স্বীকার করে না, কেবল আমার প্রবৃত্তিজনিত অভীপ্সায় আমাকে মারধোর করে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার স্ত্রী একবার মদের বোতল কেড়ে ঐ বোতল দিয়ে আমাকে প্রহার করেছিলেন খুব। তাতে বোতলটাই ভেঙেছিল আমাকে পরাধীন করে। না, প্রবৃত্তি, আর না।

তবে "লোভ কোরো না"—এই আপ্তবাক্যে আমার অবশ্য বরাবরই ডিলেমা, কেননা দেখেছি, লোভ আমার হস্ত-পদের নখাদির তুল্য। যত কেটে বাদ দিতে চাই, ততই পুনরায় বৃদ্ধি পায়।

কখন যে লোভ যায়, তার একটিমাত্র উদাহরণ আমার জানা।
আমার বোনের বাদামভাজা ছিল বড় প্রিয়। নিরলস লোভ ছিল তার ঐ বাদামভাজার প্রতি। একবার আমার জাঁদরেল, মাসিক হবার আগেই বিধবা পিসিমা, তাকে তিনদিন কেবল বাদামভাজা খাইয়ে রেখেছিলেন। তিনদিনের মাথায় সে যখন কেবল আনডাইজেস্টেড বাদাম ত্যাগ করে, তখনি তার বাদামভাজার প্রতি লোভ যায় চিরতরে। জন্মে তাকে আর ঐ বাদামভাজা খেতে দেখিনি। সে যে এত চানাচুর ভালোবাসে, সেও ঐ বাদাম বেছে বাদ দিয়ে খায়। এখনো তাই।

অতএব লোভ আসে প্রবৃত্তি থেকে। যায় স্বাধীনতা গেলে। যায় বিপন্নবোধে।

যাই হোক, ঐ ৩০ জানুয়ারী, ১৯৪৮, গান্ধী হত্যার সূত্রে টের পাই হিন্দুত্ব কত লোভী। বুক ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, যখন জেনেছি, আর. এস. এস. তথা গোপালদা, ঐ গান্ধী হত্যার দিন, সন্ধ্যায়, পেটভরে সরভাজা খেয়েছিলেন, প্রকাশ্যে, কৃষ্ণনগরে।

বিবেকও অন্তর্হিত তখন বিবেকানন্দ তথা হিন্দুমংক থেকে। হায়, বিবেকানন্দ! বিবেক আবির্ভূত হল ভিন্ন ইংরেজিতে: Give me blood, I shall give you freedom. বলতে দেরি করল না।
সেও এক দুর্ঘটনা। আমাকে নিয়ে গেল ভেন্টুসের কাছে, সদ্য আজাদহিন্দ প্রত্যাগত সিঙ্গাপুর থেকে। তাঁর কল্যাণে শুনি কদম কদম গান, শুনি, "Look up"।

সেও যায়, অর্থাৎ ঐ আজাদহিন্দ। আসে ১৯৪৭। ১৯৪৭, ১৫ আগস্টে কৃষ্ণনগরে তুমুল স্বাধীনতা। আমি ও বিবেক আদ্যন্ত নেতাজী সেজে, বুকে ব্যাজ এঁটে, আমি ও বিবেক, ট্রেনে-ট্রেনে আনন্দ করি, কেননা ট্রেনে তখন যাতায়াত ফ্রি। এবং তখনো নেতাজী কিছু আছেন।

বাড়ি ফিরি, মনে আছে ভালো, ঠিক দুপুর দুটোয়। দেখি বাবার মুখ কালো। মার মুখও কালো।

ভাত-ডাল-আলু পেঁয়াজভাজা মা বেড়ে দিলেন আমাকে, মুখে বাক্য নেই। কেমন যেন অমঙ্গল লাগে। মন খারাপ হয়ে যায়।
মা নিজের থেকে বল্লেন, তোমার বাবার মন খুব খারাপ, বাবার সামনে আজ 'জয়হিন্দ' বোলো না। আমাদের দেশ তো পাকিস্তানে চলে গেছে। বাবার তাই মন খুব খারাপ।

জানি না আর কোনো দেশের ভাগ্যে এমন হয় কিনা, জন্মভূমি স্বদেশ অব্দি বিদেশ হয়ে যায়।
বিকেল হবার আগেই টের পাই, স্বাধীনতা নয়, দেশভাগই হল ঐ ১৯৪৭, ১৫ আগস্ট।

"নচিকেতা was a fool বলেছিলেন, উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ, নচিকেতা দেশভাগ দেখে নাই, দাঙ্গা দেখে নাই—ঐ 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ' এখন বিলক্ষণ চড় খাবে। রিয়ালি নচিকেতা was a fool."
বিকেলে সে-সব বলি বিবেককে। বিবেক আমাকে শোনায়, গ্লাসে অর্ধেক জল থাকলে, দুভাবে বলা যায় সেই কথা, গ্লাসে অর্ধেক জল, অথবা গ্লাস অর্ধেক শূন্য। প্রথমটা positive সত্য। দ্বিতীয়টা negative, তাও সত্য। তবু positive সত্যই সত্য।

না কেবল positive সত্যই সত্য না, negative সত্যও সত্য এবং negative-positive মিলেই তা neutrality তাই কেবল সত্য।
তুমুল তর্কে বিবেকের সঙ্গে আমার সেদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।
আমি একা, মন খারাপ করে, অলি-গলি ঘুরতে থাকি।
প্রায় সে-সময় জগৎ দা, আর. এস. পি., জনা কয়েক জনমানুষ নিয়ে অলি-গলি মিছিল করছেন। শ্লোগান: সারে-গলিমে সোর হায় কংগ্রেসপার্টি চোর হ্যায়।··· এ আজাদি ঝুটা হায়। এবং ঐ 'এ আজাদি ঝুটা হায়' শ্লোগানই হল ঐ মিছিলের ধ্রুবপদ। আমি ঐ মিছিলের পাশাপাশি একান্তে হাঁটতে থাকি। একসময়, ঐ দিন ঐ মিছিলে আমি ঐ ধ্রুবপদের কোরাসে, অজান্তে যোগ দি'। এবং জগৎদার সঙ্গে পরিচিত হই। ক্লাশ ফাইভে প্রথম দেখা জগৎদা, আমার প্রকৃত জগৎদা হন। ঐ সূত্র। আমার মার্কসবাদী দীক্ষার ঐ সূত্র। ঐ জগৎদার কাছে।

শিখি যে, এ পৃথিবী কি ও কেমন, এই দেখাই কেবল দর্শনের কাজ নয়। এই পৃথিবীকে কি করে বদলানো যায় এ দেখাও দর্শনের কাজ। এবং প্রধান কাজ। কেননা, আমরা জন্মাই—এ পৃথিবীতে বসবাস করব বলে। এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার দায় আমাদেরই। অন্তত আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার দায় আমাদেরই। 'এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাব আমি'—এ প্রত্যয় সুকান্ত ভট্টাচার্য থেকে আমাতে ছড়ায়। আমি বুঝি এ পৃথিবীকে বদলাতে হবে।
স্থিতাবস্থা ভাঙতে হবে। স্থিতাবস্থাকে ভাঙা ও পৃথিবীকে বদলানোর স্বপ্ন আমার

এখনো গেল না। শিখি যে, এ পৃথিবীর এতকালের ইতিহাস, কেবল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। এবং এ পৃথিবী আজও শ্রেণী বিন্যস্ত। রাষ্ট্র হল—এক শ্রেণীর দ্বারা অপরাপর শ্রেণীদের শাসন-শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যম মাত্র। কিছু মানুষের ভালো থাকার থেকেই রাষ্ট্র জন্মায়।

শিখি যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদই কেবলমাত্র পৃথিবীকে সঠিক ভাবে চিনতে সাহায্য করে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ক্লাশে ঢাকুদা, ত্রিদিব চৌধুরী, শেখান, সমাজের বিবর্তন ঘটে সর্বদা, কেননা এ বিশ্বজগৎ, এ পৃথিবী, আমাদের এই মানব-সমাজ, সবই পরিবর্তনশীল। সমাজও পরিবর্তনশীল। সে বদলায় শ্রেণীসংগ্রামে। প্রথমে সমাজ ছিল আদিম সাম্যসমাজে, তারপর এল দাসসমাজ। পরবর্তীতে ক্রমে সামন্ত সমাজ, বাণিজ্যিক পুঁজিবাদী সমাজ। শৈল্পিক পুঁজিবাদী সমাজের আবির্ভাব ঘটে ঐ শ্রেণী দ্বন্দ্বেই। দ্বন্দ্বই হল বস্তুর মর্মকথা। বীজের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্বে বীজ অঙ্কুরে পরিণত হয়। তেমনি রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণে সমাজে দুই প্রধান শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ দ্বন্দ্ব হিংসাত্মক। কেননা এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে পদানত রাখতে চায়, নইলে তার অস্তিত্ব টেকে না। সে পদানত রাখতে গিয়ে অত্যাচারী হয়।

যেহেতু শাসক-শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার হল অস্ত্র, আইন-কানুন, প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনী, অর্থাৎ হিংসাত্মক মাধ্যম—যাদের দ্বারা ঐ শ্রেণী অত্যাচার করে—এবং ঐ দ্বন্দ্বের রণক্ষেত্রে তাই অত্যাচারিত শ্রেণীকেও হিংসাত্মক হতে হয়। বন্দুকের নলই শক্তির উৎস।

ত্রিদিব চৌধুরীর কাছে এ-সব শিখতে, সপ্তাহে একদিন আমাকে বহরমপুর যেতে হত। এভাবে আমি ক্রমে ক্লাশ টেনে উঠি ও ১৯৫১-তে কলেজে ভর্তি হই। তখন আমার বয়স ১৬। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের বছর ঐ ১৯৫১।

জগৎদা আমাকে, বয়স বাড়িয়ে, ২১ করে, ভোটার করেন। নিমেষে আমি সাবালক হই। সে সব কথা পূর্বেও লিখেছি।

এখন লিখি যে, আমার এই ভোটার হওয়ার বৃত্তান্ত প্রমাণ করে, আমি আসলে ভিতরে ভিতরে শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন চাই। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাই। ডুমার নির্বাচনে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক পার্টি) সর্বজনস্বীকৃত নেতা লেনিনের অংশগ্রহণ তত্ত্ব আমরা পড়ি ও অতি উৎসাহে নির্বাচনে লড়ি। তখন থেকেই ভুলগুলি আমার চরিত্র নষ্ট করে। কেননা ডুমা নির্বাচন আর ১৯৫১-র ভারতবর্ষীয় নির্বাচন একই রেখায় আসে না। এই ভুল।

অবশ্য চরিত্র নষ্ট আমার ক্লাশ ফাইভেই হয়ে গিয়েছিল। যখন কলেজ থেকে আর. এস. পি. কমিউনিস্ট, বাণীন রায়, বিতাড়িত হন এবং তাঁকে কলেজে পুনরায় রাখতে আমরা স্কুলে হরতাল পালন করি ও মিছিল করি বহরমপুরে। আমাদের স্কুল থেকে ঐ

বহরমপুরে নিয়ে যান ঐ জগৎদা, তখন তাঁকে মোটে চিনতাম না। বহরমপুরের স্কোয়ার ফিল্ডের পাশ দিয়ে আমাদের সম্মিলিত মুর্শিদাবাদ-নদীয়ার স্কুল-কলেজের মিছিল যায়। কালেকটোরেটের কাছে আমাদের মিছিল স্তব্ধ হয়। সম্মুখে সশস্ত্র পুলিশ। সবার অগ্রে ঘোড়ার পিঠে মুর্শিদাবাদের এস. পি. বিল সাহেব। তার দুহাতে দুটো উদ্যত পিস্তল।

আমরা, নদীয়া, প্রথম সারিতে। বিশেষত আমি। আমার ভীত, সন্ত্রস্ত, বিস্ফারিত নয়ন বিলসাহেবের রক্তিম নয়নের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। ভয়ে মরে যাবার মত হয়। উপরন্তু বিলসাহেব কয়েক কদম এগিয়ে আসেন।

একেবারে আমার মুখোমুখি।

আমার চোখের পলক পড়ে না।

সহসা দিকবিদিক কাঁপিয়ে শুনি, বৃটিশ সিংহ বিলসাহেবের সিংহনিনাদ, বিশ্বাস করুন, সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে—তখন সবে শেষ করেছি সেই শ্লোগান: "বাণীন রায়—কলেজে থাকবে" অন কনট্রাডিকশন, তৎক্ষণাৎ, বিল সাহেবের সেই সিংহনিনাদ, আমাকেই লক্ষ্য করে, "কি, বাণীনডায় কালেজে ঠাকবে?"

—না, থাকবে না। বলার অপেক্ষায় থাকি না আর। পা দুটো পলায়নী হতে থাকে। ভয়ে নীল হয়ে ঐ "না থাকবে না" বলামাত্র মিছিল ভেঙে স্থানান্তরে পালাই।

তো ঐ ১৯৫১-তে, ১৬ বছরকে ২১ করে, আমি যে নির্বাচনে ভোট-ভোট করে লড়ি, সে তো ঐ মিছিল পালানোর শ্রেণী চরিত্রেই।

সেই ১৯৫১-র মে দিবসে আরেকটি ঘটনা ঘটে। শহরের সর্বত্র দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়ে: মে দিবস জিন্দাবাদ, দুনিয়ার মজদুর এক হও।

কেবল আর. এস. পি. ও ফরোয়ার্ড ব্লকের পোস্টার পড়ে। তখনো কমিউনিস্ট বিগব্রাদার সি. পি. আই. আসরে নামেনি। জগৎদা বলতে ছাড়েন না, "দেখলি তো ঢাকুদার ঐ সুইংব্যাক বইখানার পাতাগুলি কেমন মিলে যাচ্ছে, ঐ সি. পি. আই. হল, সংসদীয় পথে যাওয়া মেকি বিপ্লবী, দেখছিস তো মে-ডের শ্লোগান অব্দি ভুলে গেছে, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' দেয়ালে লিখতে ভুলে যাচ্ছে।

জগৎদারও জগৎ দেখা বাকি ছিল।

মে-ডের অতি প্রত্যুষে দেখা গেল সব পোস্টারের তলায় কেবল সি. পি. আই-এর শিলপ আঁটা। ঐ আর. এস. পি. ও ফরোয়ার্ড ব্লকের পরিচয় আদ্যন্ত ঢেকে।

বুঝতে বাকি থাকে না যে, সব শেয়ালের এক রা হলেও শেয়ালেরা শিকারের তরে দলবদ্ধ হয় না সাধারণতঃ।

এখানে সবিনয়ে লিখে রাখি, নেহাতই উপমাবশত ঐ শেয়ালপ্রসঙ্গ, নতুবা কমিউনিস্টদের ব্যাপারে যা কিছু ভাবি না কেন আমার সোনালী সিংহের গল্প মনে পড়ে, তারই আবহ থাকে অন্তত। একটা লাইন ঘুরে ফিরে মনের ভিতর কাজ করে যায় খুব। সে লাইন

যতদূর মনে পড়ে, তবুও ইতিহাসে ফের সোনালী সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হয়ে যদি না সূর্যাস্তে ফের হয়ে যায় সোনালী হেঁয়ালী।

যদি ভুল না ভেবে থাকি, তাহলে ঐ সোনালী সিংহ হল আমাদের স্থিতাবস্থা ভাঙার প্রতীক, সে অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হতে চায়—কিন্তু তাকে অবশ্যই ঠিক মুহূর্তকে ধরতে শিখতে হবে, সে যেন সূর্যাস্তকে সূর্যোদয় মনে করার সোনালী হেঁয়ালীতে আর না পড়ে। এই 'সোনালী হেঁয়ালী'ই হল 'সুইং ব্যাক', একেবারে রাজনৈতিক ভাবে, ঐ হল রিভিশনিজম।

৬০-এর দশকের গোড়ায়, তৃতীয় নির্বাচনে, আমি আসানসোল। মাইনে পাই ২৩৫ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। হাতে তাই পাই। ঐ হাত থেকে ১০০ টাকা তুলে দিলাম নির্বাচনী ফান্ডে। মজার ব্যাপার ঘটল। ঐ একশ টাকার নোটে, ইমোশন-বশত আমি জল ছাপের হোয়াইটে, একটি ছোট্ট লাল তারা এঁকে দি' সঙ্গে ছোট্ট করে কাস্তে হাতুড়ি। মোটেই তেমন করে চোখে পড়ার মতো ছিল না। আর ছিল না বলেই ঐ মজার কাণ্ড। পূর্বে বাদামী খামে ক্যাশটাকায় মাইনে পেতাম। খামের উপর লেখা থাকত সব। স্ত্রী, বুকের ভিতরের পকেট থেকে, ঐ খাম বের করে ড্রয়ারে রাখবার আগে গুনে নেয়।

—একশ টাকা কম কেন ?

—বিপ্লববাবু নিয়েছেন।

—ঐ সেই বকবক মাস্টার। কি যেন সাবজেক্ট ?

—ইতিহাস।

—ইতিহাসের লোকেরা বড় বকবক করে। দেখবে, টাকা ফেরত পাবে না।

—পাব। কালই পাব।

—দিলেন ফেরত, টাকা ? আজই তো দেবার কথা ছিল।

—আজ পারলেন না। কাল ঠিক দেবেন।

কৈ, দিলেন ফেরত, টাকা ? জানতাম—দেবেন না, কেবল কাল কাল করবেন।

বিপ্লবকে বাঁচাতে বাল্যবন্ধু প্রভাতের কাছে হাত পাতি।

এই পোড়া আসানসোলে তখন একমাত্র মরূদ্যান ঐ প্রভাত।

—একশ টাকা ? দাঁড়া দেখি !

নো প্রোবলেম রঞ্জনদার কাছে রেডিমেড টাকা থাকে। চল্, যাই।

—রঞ্জনদা কে ?

সে কি রঞ্জনদাকে চিনিস না, আসানসোলে ভোট-ভোট করিস, চল দেখবি। নো প্রোবলেম।

হাটন রোডে যাই। বিশাল পানের দোকান। ভিতরে দাঁড়িয়ে দুলতে দুলতে পান সাজছেন এক ফর্সা, ছিপছিপে ভদ্রলোক।

—রঞ্জনদা ?
—বল্। কি ব্যাপার ? আর যে দেখাই নেই, তবে আমিও যাচ্ছি না তোদের রেলে অনেক দিন, বর্ষা তো। বল, কি ব্যাপার !
—একশ টাকার যে খুব দরকার।
—আগে পান মুখে দে তো !
—অমন কড়কড়ে একশ টাকা, এক কথায় দিয়ে দিল ?
—তাই দেয়।
—পানের দোকানের এত আয় ?
—দূর, ঐ পানের দোকান তো একটা নামাবলী।
—মানে ?
—মানে উনি হলেন আসানসোলের মুসকিল আসান। আগে কংগ্রেস ছিলেন, এখন সি. পি. আই.। যে দলেই থাকুন। তোলার রোজগার বন্ধ হয় না। হাতে অনেক গুন্ডা। ওর দাপটেই সি. পি. আই. রেলপাড়ে ঢুকতে পেরেছে। নে, এ টাকা ফেরত দিতে হবে না।
—মানে ?
—উনি টাকা দিলে টাকা ফেরত নেন না। অন্য সুবিধে নেন।
—কি ?
—আরে আমি রেলে কাজ করি না !
—তো, কি ?
—উনি যে বড় বড় কাপড়ের দোকানগুলির হয়ে তাদের মাল, সে বম্বে থেকেই আসুক, অথবা হাওড়া থেকে, উনি হাপিস করেন। ওয়াগন ভেঙে। তারপর ঐ দোকানদারদের যার যার জিনিস দিয়ে দেন। দোকানদাররা কাপড়ের গাঁট খোয়া যাওয়াতে কোম্পানী থেকে পুনরায় মাল পায়। কোম্পানী রেল থেকে / বীমা থেকে কমপেনসেশন আদায় করেন। অর্থাৎ ঐ রেল-বীমায় আমাদের কর থেকে যে টাকা হয়, সেই টাকাই খাটে। উনি আর ফেরত নেবেন কেন ? ও তো তোর-আমারই টাকা, আলটিমেটলি।
—কি যে বলিস ?
—গভমেন্টকে ট্যাক্স্ দিস তো ?
—হ্যাঁ, দি তো, কি ?
—সেই টাকায় রেল হয়, বীমা হয়, মিলিটারী হয়, পুলিশ হয়, কোর্ট হয়, জেলখানা হয়, মন্ত্রীদের গাড়ি হয়, বাড়ি হয়, তারা ঐ টাকায় ভি. আই. পি. হয়—কত কি হয়, সরকার দেয়। সরকারের রোজগার আছে নাকি ? সরকার কি চাকরি করে না ব্যবসা করে ? সরকারের রোজগার হল ঐ ট্যাক্স্। যা হোক তোকে এসব জ্ঞান দেয়া আমার কম্ম নয়। সোজা কথা, টাকা পেয়েছ—খরচ করো—নো প্রোবলেম।
বাড়ি গিয়ে স্ত্রীর হাতে তুলে দি একশ টাকা। গর্বের সঙ্গে।

—দেখলে তো বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ঠিকই ফেরত দিল। স্ত্রী খুঁটিয়ে দেখে টাকা। জলছাপ আছে দেখে আলোয়।

—একি !

—কি ?

—এ টাকা তো চলবে না।

—কেন ?

—এই দেখো, লাল তারা আঁকা। আবার কাস্তে হাতুড়ি।

হাতে নিয়ে ঐ লাল তারা কাস্তে হাতুড়ি দেখতে দেখতে হতবাক হয়ে যাই। বুকে বাজে সার্কাসের ড্রাম। জোকার বাজায়।

উদয়ন ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়, মনে আছে, ১১ আগস্ট ১৯৫৮। ঐ দিন থেকে আমি তাঁর কোলাঁগ। তাঁকে কিছু কথা মাঝে মাঝে বলি। একদিন অশুভ মুহূর্তে ১৯৭০-এ তাঁকে আরও কিছু বলি। বলি যে, লাল তারা কাস্তে হাতুড়ি এখন মস্তান হয়ে গেছে। তিনি হাসেন কেবল। চুপচাপ থেকে একটা ডাইরী খোলেন। পকেট ডাইরী। সেখানে দেখি পদ্য লেখা। তার থেকে একটি পদ্য পড়েন :

সুকান্ত শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রিয়তমাসু—পাঠে আপনি যে পদ্যটি লিখেছিলেন
১৯৪৬ এ—
১৯৭০ এ আমি তার পাঠোদ্ধার করি।
এখন '৭০-এর দশকে
যখন ধানের দোসর হতে চায় কাশফুল,
তখন ভালোই বুঝি আপনার প্রিয়তমা কে !
এও বুঝি, কেন আপনি সীমান্তের প্রহরী ছিলেন !
আপনি কবি, তবু কেন আপনার গায়ে
সৈনিকের কড়া পোষাক !
কেন আপনি কবিতাকে ছুটি দিলেন,
কেনইবা আপনার প্রয়োজন হল না কবিতার স্নিগ্ধতা।
—এসব ক্রমে বুঝি।
কেন পূর্ণিমা চাঁদ আপনার ঝলসানো রুটি মনে হল !
আর কেনইবা গদ্যের কড়া হাতুড়িকে
আপনি হানতে চাইলেন—
এও ক্রমশঃ বুঝি।
আপনি তো আমাদের জানিয়েইছেন ১৯৪৬ এ—
পরের জন্য আপনি যুদ্ধ করেছেন অনেক
এবার আপনি যুদ্ধ করতে চান নিজের ও দেশের জন্য।

শুনুন, সুকান্ত।
আপনি যখন দেশের জন্য যুদ্ধ সুরু করার আগে
অকালে নিহত হলেন
বিনা চিকিৎসায়
রাজরোগে—
তখন সেই স্বাধীনতা, ১৯৪৭ এলো। ১৫ আগষ্টে।
তখন বুকে নেতাজীর ব্যাজ পরেও বুঝিনিতো,
স্বাধীনতা নয়
দেশভাগই বস্তুত
১৫ আগষ্ট, ১৯৪৭ ?
এও বুঝিনি, আমিও অবাধ্য হয়েছি ঢের।
ভরদুপুরে নিজের গোয়ালের গাইডাক শুনেও শুনিনি।
শুনিনি জ্যোৎস্না রাতে পাড়ার কুকুরের কান্না।
রাশিয়া-চীন-ভিয়েৎনামের যুদ্ধ জয়ের ফাঁকে ফাঁকে
কতবার আপনার মতো আমারও হৃদয় জ্বলেছে
অনুশোচনার অঙ্গারে। পরের ভাবনায়।
পরের ভাবনায় নিজের দেশের জন্য কিছু কি করেছি ?
নেমেছি কি কাস্তে হাতে মাঠে ?
গাঁয়ের জন্য এক আঁজলা জলও এনেছি কি ?
চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছি কি অত্যাচারীর কৃপাণ ?
দেশ ও দশের ভাবনায় এক ঘুম
কেড়েছি কি সুপ্ত থেকে ?
এসব প্রশ্নে এখন বুক পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে আমার।
সবাইকে দারিদ্রের মধ্যে ফেলে
দুর্ভিক্ষের আগুনে ছুঁড়ে
ঝড়ে ও বন্যায়
মারী আর মড়কের দুঃসহ আঘাতে
বারবার
অস্তিত্ব বিপন্ন করে
ছুটে গেছি এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরেক যুদ্ধক্ষেত্রে—
রাশিয়া থেকে চীন
চীন থেকে ভিয়েৎনাম
ভিয়েৎনাম থেকে কাম্বোডিয়ায়

অনেক ঘুরেছি আমি।
একবার ভাবিনি তো, আপনার-আমার
প্রিয়তমা দেশ
শেষ পর্যন্ত আছে কি নেই!
দুর্ভিক্ষে ফাঁকা আর বন্যায় তলিয়ে গেছে কিনা ভিটে
খোঁজ নি'নি তো!
লেনিন স্পন্দিত বুকে
'আমিই লেনিন', মনে হয়েও
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভেঙে
বেরিয়েছি কি অগ্রগামী অনুভবে স্নিগ্ধ হয়ে
দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানবে?

আপনাকে আজ জানানো ভালো,
এই ১৯৭০-এ আমাদের চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে
বিদেশীর কাছে ঋণে
কাস্তে-হাতুড়ি-তারার বুকেই
ঐ হাতুড়ি মেরেছি।
খাপ সমেত ভোজালি গেঁথেছি ভ্রাতৃবক্ষে।
কিন্তু এখনো আপনারই মতো আমিও সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে,
অথচ নিজের ঘরেই যার নেই বাতি জ্বালার সামর্থ্য। নিজের
ঘরে জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি

ঐ ১৯৫১-তে যখন আমার ১৬ এক কলমের খোঁচায় **২১** হল, তখন, তৎক্ষণাৎ, আমার সরু লিকলিকে বাঁ মণিবন্ধে ডান করতল বেষ্টন করে দেখেছি, বাঁ মণিবন্ধ পরিণত হয়ে কিছুটা মাংসল হয়েছে যেন। পূর্বে ঐরকম বেষ্টনে বাম মণিবন্ধ বড় রোগা লাগতো।

আনন্দময়ী তখন, লেখা বাহুল্য যে, এসে গেছেন। ঐ সুবাদে একদিন কারে ওঁকে নিয়ে উঠে, বাড়িতে কেউ ছিল না ঠাকুমা ছাড়া। তিনি তখন আফিঙের ঘোরে ঢুলছেন বড় ঘরে।
আমরা নীরবে কারে উঠেছি।

আনন্দময়ী, উঠতে উঠতে, বলতে ছাড়েননি, খুব যে লায়েক হয়েছিস, একেবারে টেনে ওঠাচ্ছিস আমাকে ?
আমিও বলতে ছাড়িনি কারে উঠে ও ওঁকে তুলে, জানো আজ আমার ২১ হল।
গালে চিমটি কেটে তিনিও বলতে ছাড়েননি, সে আবার কি ?
সব তাঁকে বলি। শীতল হয়ে যান, সর্বনাশ হবে তোর !

হ্যাঁ, সর্বনাশই হল আমার। এক ফোঁটা শান্তি রইল না আর জীবনে।

বরাবরই দেখেছি, বয়সকে বাড়িয়ে ভাবা, আমার এক দস্তুর। এত যে লোকে আমাকে এঁচোরে পাকা বল্লেন আকৈশোর, এত যে শুনলাম, পেকে পচে গেছি, তবু যদি চৈতন্য হয়, লোকসমাগমে আমি এখনো জ্ঞানদান করি। অসহ্য, নিজের কাছেই অসহ্য। আর লোকের কাছে তো বলার নেই। লোকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন, অন্যের কথায় হাসবেন, আমার দিকে একপলক, ঐ, "ও আচ্ছা" ধরনের জ্ঞানের কথা শোনার ভঙ্গি রাখবেন, তবু যদি আমার জ্ঞান হয়।

ভাগ্য ভালো, আমি যে এলাকার ভার পেয়েছি, সেখানে সি. পি. আই, অর্থাৎ কাস্তে ধানের শিষ। না, ভাগ্য ভালো না। ঐ সি. পি. আই. প্রবাহেই যা কিছুর জন্ম তাই দেখেছি শেষ অব্দি শুয়োরের খোঁয়ারে গেছে। এবং ঐ শুয়োরের খোঁয়ারই সেই প্রসঙ্গ, যে প্রসঙ্গে গিয়ে আমি বকুনি খাই ঐ সি. পি. আই. থেকে।
—খুব বেশি পড়ে ফেলেছ। জ্ঞান দিও না আমাকে। ডুমা-নির্বাচনে লেনিনের দলিল আবার পড়। পড়ে পড়ে কণ্ঠস্থ করে ফেল।
হায় ডুমা, হায় ১৯৫১-র ভারতবর্ষ !

আমার সর্বনাশ হয়ে যায়, ১৯৫১-র ভারতবর্ষ বুঝতে। বুঝতে পারি না। আজ বুঝি, ঐ রুশ ডুমা মাথায় থাকলে কি করে বুঝব ?
এই সর্বনাশ আমার প্রাত্যহিকী জীবনেও ঢোকে। আমার জীবনে আমি আনন্দময়ীর আগমনের সমাজবৈজ্ঞানিক কারণ আর টের পাই না। কোন দ্বন্দ্বে আনন্দময়ী-বস্তুর প্রকাশ আমার জীবনে, বিশ্লেষণ করার মানসিকতা হারাই। অথচ মনে আছে ভালো, মার্কসবাদ শিক্ষাকালে আমি আয়ত্ত করছিলাম ঐ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগ আমার জীবনে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবাহে যে আমার ও আনন্দময়ীর জন্ম তা বুঝি কিছু। মাতামহী স্নেহলতার অবজেকটিভিটিও বুঝতে সুরু করেছিলাম। পুরো বুঝবার আগেই ঐ নির্বাচন এসে গেল।
এ কি ডুমার নির্বাচন ?

রাশিয়ার নিহিলিস্ট দলের কথা পড়েছি। লেনিনের দাদা সেই দলে ছিলেন। তাঁরা চাইতেন, জারের ক্ষমতা খর্ব হোক। সাধারণ মানুষের ক্ষমতা বাড়ুক। দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশের প্রজাদের হাতেই থাক। এমনকি, এই জার-ক্ষমতা খর্ব

করতে তারা ব্যক্তিগত আক্রমণে গেলেন। ১৮৮১ সালে, দ্বিতীয় আলেকজান্ডার, তখনকার জার, নিহিলিস্টদের বোমার আঘাতে নিহত হলেন। দলের উপর অত্যাচার সুরু হল। নিহিলিস্টরা ছত্রভঙ্গ হলেন। এই হয়—ব্যক্তিহত্যার ফলশ্রুতি হল এই, কেননা ব্যক্তিহত্যা দলের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে নষ্ট করে। সমাজতন্ত্রী দল গড়ে উঠল ঐ সময় প্রায় একই উদ্দেশ্যে। কেবল তফাত এই তাদের মধ্যে ছিল আন্তর্জাতিক ধ্যান-ধারণা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর সব দেশের ধনীদের হাত থেকে দেশ-শাসনের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কৃষক-শ্রমিককে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য সংগঠিত করা। লেনিন এই দলের নেতা। নেতা আরও ছিলেন। ট্রটস্কি। স্ট্যালিন। ১৯০৫-এ ঐ তিন নেতার নেতৃত্বে রাশিয়ায় এক বড় ধরনের বিপ্লব হয়। শেষরক্ষা হয় না। দুবছর আগে ঐ সমাজতন্ত্রী দলে উপদলীয় কোন্দল সুরু হয়। এই আরেক মনুষ্যস্বভাব, এই উপদলীয় কোন্দল। মানুষ ভালো, মানুষের সহৃদয়তার সীমা নেই, তবু মানুষ পরনিন্দা বড় ভালোবাসে। যা থেকে উপদল হয়। জানি না, এও আমার পরনিন্দা হল কিনা!

ঐ উপদলীয় কোন্দলে দুটি দল হয়ে যায়। বলশেভিক, যে দলে অধিকাংশ বিপ্লবী, অধিকাংশ মানেই বলশেভিক। অপর দল মেনশেভিক। মেনশেভিক কথাটার মানে অল্পসংখ্যক লোক। লোক, খেয়াল করুন, আমি এস্থলে বিপ্লবী বলছি না। তো ঐ বিপ্লবী বলশেভিক ১৯০৫-এ বিপ্লব সংগঠিত করে। তখন রুশ-জাপান যুদ্ধে দেশের লোকের দুর্দশার অন্ত ছিল না। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একজন ধর্মযাজক, নাম ভুলে গেছি, গ্যাপন্ সম্ভবত, কয়েক হাজার লোক নিয়ে জারের কাছে প্রতিবাদী যখন, তখন জার ছিলেন নিকোলাস। কসাক সৈন্যরা ছিল নিকোলাসের ঠাঙারে বাহিনী। কোথায় বৈদেশিক শত্রুকে, জাপানকে মার দেয়ার ট্রেনিং নেবে, বদলে দেশের লোকদের মার দেয়ার ট্রেনিং নিল তারা। নিকোলাসকে এই বুদ্ধি দিয়েছিল ওর তখনকার সেনাপতি। নাম ভুলে গেছি। সে সৈন্যসামন্ত নিয়ে অর্থাৎ মারকুটে বাহিনী নিয়ে ঐ যাজক নেতৃত্বের শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করেছিল চাবুক মেরে। অত্যাচারীরা ঐ রকমই অত্যাচার করে। নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন বোধ করলে তারা অত্যাচারী হয় কিন্তু তারা ঐ কর্ম কোরে আসলে নিজেদের পায়েই কুড়াল মারে। নিরস্ত্র জনসমাবেশের উপর অত্যাচার, অনেকটাই আমাদের জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার মতো। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের ঘটনা ঘটে ঐ রুশ ১৯০৫-এর প্রায় ১৫ বছর পর।

রুশ বিপ্লবীরা খেপে গেল। চতুর্দিকে ধর্মঘট-অবরোধ সুরু হল। প্রজাসাধারণের হাতে ক্ষমতা দেবার ব্যাপারে সর্বদাই শাসকদল বড় কৃপণ হয়। কিন্তু এখানে তা হল না। অকৃপণ হতে বাধ্য হল জার। ১৯০৫-এই জার ঘোষণা করলেন যে একটি রুশ পার্লামেন্ট হবে, যার নামই ঐ ডুমা।

প্রথম ক্ষমতা দখলের পদক্ষেপে ঐ ডুমা বিপ্লবের একটি পদক্ষেপ। পুনর্সংগঠিত হবার 'স্টেপ্' মাত্র। কেননা তার আগেই ১৯০৫-এর বিপ্লবকে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে।

আমাদের ১৯৫১-র ভারতবর্ষের সঙ্গে মেলে কি ঐ অবজেকটিভ কন্ডিশন? বলতে গেলেই দাদাদের কাছে বকুনি খাই।
তাদের নির্দেশক্রমে লেনিনের ডুমা নির্বাচনের দলিল কণ্ঠস্থ করি। অনর্গল বলি ঐ দাদাদেরই কাছে। ডুমা নির্বাচনে কিন্তু লেনিন বিধিবদ্ধ পথে গেলেও, সংসদীয় পথে গেলেও, অবৈধ পথে, অসংসদীয় পথে, একসট্রা পার্লামেন্টারি মেথডের পথে সংগঠন করতে থাকেন আন্ডারগ্রাউন্ডে।
—তোমার বদহজম হচ্ছে। তুমি অন্ধ তাই দেখতে পাও না, আমরা একসট্রা-পার্লামেন্টারি পথ পরিত্যাগ করিনি।

দুদিনেই একসট্রা পার্লামেন্টারি পথ আমার দেখা হয়ে যায়।
নির্বাচনের দিন দাদারা রিকসো করে নির্দিষ্ট ভোটার আনতে নির্দেশ দেন বুথে। আমরা অনেক যুবা (যুবাই তো!), মহা উৎসাহে ঐ কর্ম করি। দাদারা কানে কানে বলে দেন, অনুপস্থিত কংগ্রেস ভোটারদের এই তালিকা কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরীক্ষা কর। জেনুইন অ্যাবসেন্টির নামের পাশে টিক মারো। তাদের বাপ-ঠাকুর্দার নাম মুখস্থ কর। বিবাহিত মহিলাদের স্বামীদের নাম কণ্ঠস্থ কর। এই এরা থাকল তোমাদের জিম্মায়, এরা ঐ অনুপস্থিতদের প্রকসি দেবে। যেমন তোমরা দাও আর কি কলেজে, প্রকসি। মার্কামারা না হওয়া পর্যন্ত। মার্কামারা কংগ্রেস অনুপস্থিতদের হিসাবে এনো না। প্রকসির ব্যবস্থা করো যারা গড্ডালিকায়। না, আমি প্রকসি দিতাম না। আমি দেইনি কোনোদিন। নিজের বয়স ভাঁড়িয়েছি কিন্তু নাম ভাঁড়াতে কুণ্ঠা আসে। কিন্তু আমি ঐ অনুপস্থিতদের তালিকা compare করতে বাধ্য হই। বিশ্বাস করুন, ঐ ফলস ভোট ঐ ১৯৫১-তেই সুরু হয়। এখন তো গগনচুম্বী ও প্রকাশ্য। তখন অন্তত লজ্জা-সরম ছিল। ছাপ্পা মারা হত না। বুথ দখলও না।

এই ফলস্ ভোটিং টের পেয়েছি, গণতন্ত্র তথা সংসদীয় পথের শত্রু। অর্থাৎ এই একমাত্র একসট্রা পার্লামেন্টারি পথ তখন সি. পি. আই. এর। বাকি সব ক্রমে সংসদীয় বানের জলে ভেসে যায়। ভেসে যায় ডুমার দলিলে লেনিনের সেই নির্দেশ, "**ডুমায় যাও, জনসাধারণকে একত্রিত করো।**" ভেসে যায়, ঐ অমোঘ নির্দেশও, "**বলশেভিক তত্ত্ব বোঝাও জনগণকে, ভোটারদের—এই নির্বাচনী প্রচারে এখুনি বাধা পাবে না, এই মস্ত সুযোগ গ্রহণ করো।**" এ-সবই ভেসে যায়। ভেসে যায়, "আন্ডারগ্রাউন্ডের কাজ অব্যাহত রাখো।" ভেসে যায়, 'সংগঠনকে ঐ আন্ডারগ্রাউন্ডে মজবুত করো।'
এও ভেসে যায়, লেনিন এক সময় ঐ পার্লামেন্টকেই বলে বসলেন, শুয়োরের খোঁয়ার। যখন পার্লামেন্টে সাধারণ মানুষের ক্ষমতার কোনো অস্তিত্বই রইল না।

পার্টি গণতন্ত্র একপ্রকার ফ্যাসিবাদ। ঐ পার্টির মধ্যেই আমাকে ভোট দিতে হবে। বিকল্প নেই।

শুয়োরের খোঁয়ার দেখিসনি তুই ? অথচ লক্ষবার ঐ শুয়োরের খোঁয়ারের কথা বলিস চল্‌—তোকে দেখাই।
আনন্দময়ী একদিন ঐ কথায় আমাকে ধাঙড় পাড়ায় নিয়ে যান—দেখি শুয়োরেরা এক জায়গায় কেবল গুঁতোগুঁতি করছে, কেবল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে, কেবল নিজের কোলে ঝোল টানছে, কেবল একজনকে ঢুঁশ মেরে খাবারের জায়গায় নিজে ঐ খাবার ইনডিভিজুয়ালি খাচ্ছে, কেবল এর-ওর-তার সঙ্গে সহবাস করছে, কেবলি শুয়োরের বাচ্চার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। ওদের স্তনও চার জোড়া।
মানুষের কিন্তু এক জোড়া। এর মধ্যেও তো এক ধরনের প্রাকৃতিক নির্দেশ আছে। মানুষের সর্বাপেক্ষা বিপরীত শুয়োর। সেজন্যই তো মনুষ্যসমাজে সর্বাপেক্ষা বড় গাল হল শুয়োরের বাচ্চা। দুনিয়ায় সর্বত্র ঐ একই গাল। যদিও দুনিয়ার অনেকানেক দেশের ঐ শুয়োরের মাংসে রুচি।

আমি ক্রমে নষ্ট হতে থাকি।
একটি ঘটনায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই। যখন দেখি, নির্বাচনে জেতার জন্য কি আর লিখব, নির্বাচনে জেতার জন্য কাস্তেধানের প্রার্থীর স্ত্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিভূতি চাইছেন। যে বিভূতি রামকৃষ্ণ দিতে চাইতেন না।

বারোটা বাজে আমার। বারোটা বেজে পাঁচ।

কার কাছে যাব ? ঐ উদয়ন ঘোষও তাই। এক জব্বর কবিতা লিখে হাত ধুয়ে মুছে ফেলেন। কবিতাটা প্রকৃতই জব্বর।
কবিতাটা অবশ্য '৮০র দশকের। তবু এখন কবিতাটা, অর্থাৎ ঐ সময়ে কবিতাটা অর্থবহ ছিল অধিকতর।

শ্রুতি-প্রতিশ্রুতি

কথা কেউ রাখেনি
কথা ছিল ল্যাম্পপোস্টে
ঝুলবে অসামান্য কালোবাজার
এখন সামান্য ল্যাম্পও ঝোলে না সর্বত্র
তবে কি গীর্জামোড় থেকে স্টেশন রোড পর্যন্তই, কেবল
স্বর্গ কেনা হল ?
বাকি সব ঋণ শুধল আই. এম. এফের ?
তাহলে আর কোনো কথা না
হাড় হাভাতের হাত ধরা ছেড়ে দাও
প্রতিশ্রুতি লিখ না দেয়ালে
পার্লামেন্টে শুয়োর ঢুকছে

জাতীয় সংহতির পণ্য সুচেতনাকে ডেকো না আর
ভাসান আসছে
চলো বনে যাই
চলো ফের শুরু করি বর্বরতা।

তখন কে জানত, এই নির্বাচনী ডামাডোলে, এই বখে যাওয়া কাস্তে ধানের শিষ ও হাতুড়ি তারায়, এই সাম্প্রদায়িক ভোটব্যাংকে, এই গাঢ় অন্ধকারে, আমার সঙ্গে সরোজ দত্তের দেখা হয়ে যাবে একদিন।

অবশ্য ঐ উদয়ন ঘোষই আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন। তখন অন্তত ঐ উদয়ন ঘোষের বুক জ্বলতো খুব, কেন কে জানে? বলেছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কোট্ করে পদ্য—বড় অদ্ভুত পদ্য :

কোথাও মানুষ ভালো রয়ে গেছে বলে
আজও তার নিঃশ্বাসের বাতাস নির্মল
যদিও উজীর, কাজী, শহর-কোটাল
ছড়ায় বিষাক্ত ধুলো, ঘোলা করে জল
তথাপি মানুষ আজো শিশুকে দেখলে
নম্র হয়, জননীর কোলে মাথা রাখে,
উপোসেও রমণীকে বুকে টানে, কারও
সাধ্য নেই একেবারে নষ্ট করে তাকে।

মনে পড়ে, নষ্ট হয়ে যাই, নষ্ট হয়ে যাই ভাবতে ভাবতে একদিন উদাস হই বড়। বলব কি, ওই আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী আমার, চোখ চেপে ধরেন, পিছন থেকে, আমার। করতলের গন্ধে টের পাই। মুখে কিছু বলি না। চোখ চেপে ধরে থাকেন। করতলের গন্ধে টের পাই। মুখে কিছু বলি না। কয়েক দণ্ড কেটে যায়। কয়েক মুহূর্ত হয়ত। অনন্ত হলে ভালো হত। ততমধ্যে আমি যদি মরে যেতাম আরও, ভালো হত। ইত্যবসরে আমি আরও যদি নষ্ট হয়ে যেতাম, আরও, আরও ভালো হত। আমি ঐ মাতৃগন্ধী করতল চেপে ধরি।

—খুবই পেকেছ যা হোক।
—বাঃ আমার ২১ না?
—হ্যাঁ একুশই তো, একুশে আইনের একুশ।
—আমার ভোট দেয়া সারা। আমার কর্তব্য সারা। আমার ছোট ভায়ের কাজ সারা।
—কি বাজে বলছিস? কেবল বকবক করে তোর মাথাটা গেছে। শ্লোগান দিয়ে গলাও গেছে। ভোট দিয়ে তোর দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
—মাথা খারাপ হয়নি, মাথা গরম হয়ে গেছে।
—কৈ দেখি?

বলেই মা আনন্দময়ী ঐ স্বর্ণময়ী পুকুরের ধারে, জ্যোৎস্নায়, আমার মাথার পিছনটা নিজের বুকে রেখে আমার কপালে হাত দেন।
—কৈ ? একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা তোর কপাল, তোর মাথা।
কি আর লিখব ! তার কত বছর পর ঐ কবিতা শোনা। ঐ 'তথাপি মানুষ আজো শিশুকে দেখলে নম্র হয়, জননীর কোলে মাথা রাখে !'
সেদিন, বাস্তবিক, আমি মা আনন্দময়ীর বুকে মাথা রেখেছিলাম। কিন্তু ঘটনা একই। ঐ সরোজ দত্তকে দেখার পর, ভুল লিখছি, ঐ সরোজ দত্তকে দেখব বলেই, ঐ মাথা রাখায় আমার নিঃশ্বাস নির্মল হয়। জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম, তেমনি রেস্ট পেয়েছিলাম ঢের।

—এত মাথা গরম করিস কেন ? শুনলাম তোর সঙ্গে নাকি তোদের পার্টির ঝগড়া হয়েছে খুব ?
—ঝগড়া না, তর্ক।
—ঐ তর্কই ! কি নিয়ে ?
—সে তুমি বুঝবে না।
—খুব বুঝব। তোর মনের কথা তো বুঝব।
—এই ভোট-ভোট নিয়ে।
—সে আবার কি ?
—এই লেনিন নিয়ে।
—তোরা কমিউনিস্টরা মোটে সাধারণ লোকের মতো কথা বলতে পারিস না। তোদের কথা আর কি বলব, কথাটা ইনকিলাব, তোরা বলিস ইনক্লাব—ইনকিলাব মানে হল, বিপ্লব—আহারে, তোরা বিপ্লব কথাটাই উচ্চারণ করতে পারিস না।
—সে সবাই না। সবাই ঐ ইনক্লাব বলে না।
—না বল্লেও, শ্লোগান তো ঐ ইনক্লাবই হয় ! যাক তোর বিষয়টা কি ?
—কিছু না, কমিউনিস্টদের ভোটের পথে যাওয়া উচিত না।
—হ্যাঁ, কেবল ডাণ্ডাবাজি করা উচিত।
—হ্যাঁ, ডাণ্ডাবাজিই করা উচিত। যত ডাণ্ডা মারতে দেরি হবে, তত ওরা আত্মরক্ষার অস্ত্র শানাবে, তত আমাদের বুকে অস্ত্র বিঁধবে।
—তুই দেখছি, পুরোই কমিউনিস্ট হয়ে গেলি।
—কমিউনিস্ট মানে জানো ?
—জানি বৌক ! যারা কম অনিষ্ট করে, কি খুশি তো ? কিন্তু ঐ তোরা কমরেড কমরেড করিস—ওর মানে হল তোরা আসলে কম রেড, বেশি রেড না।
—তুমি ভালো ইংরেজি জানতে পার—তাই বলে কমরেড-কমিউনিস্ট—এসব ট্রান্সলেট করতে পার না। ওটা করতে গেলে পড়াশুনো করতে হয়। কেবল পি. কে. দে

সরকার পড়লে হবে না, কেবল ইংরেজি বাইবেল পড়লে হবে না, কেবল ক্ল্যারেনডন রিডার পড়লে হবে না, কেবল পি. সি. রেন পড়লে হবে না, কেবল চেম্বার্স দেখলে হবে না, কেবল অকসফোর্ড দেখলে হবে না—কেবল—

—থামতো, তখন থেকে কেবল 'কেবল-কেবল' করে যাচ্ছিস! তোর মাথাটা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে।

—শোনো, তোমাকে যদি কয়েকটা বই এনে দি'—ইংরেজি আমাকে বোঝাবার জন্য, পড়বে?

—কি বই?

—রাগ করবে না, বল!

—পড়াশুনোর ব্যাপারে রাগ করব কেন? বল!

—প্রথমে 'গোথা প্রোগ্রাম,' তারপর ঐ 'ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলোপমেন্ট অব সোসাইটি। ফ্যামিলি, স্টেট···, তারপর 'স্টেট অ্যান্ড রেভোলিউশন, তারপর মাত্র দুটি বই থেকে কিছু কিছু—ফার্স্ট হল, কালেকটেড ভলিউমস অব মার্কস অ্যান্ড এঙ্গেলস—লাস্ট হল, কালেকটেড ভলিউমস্ অব ভি. আই. লেনিন। আর যদি তোমার বিরক্তি না আসে, তাহলে এ-সব পড়ার পর, আমাকে বোঝানোর পর, দুজনে মিলে বোঝার পর, আমরা একসঙ্গে পড়ব মাও-সে-তুঙের, 'অন প্র্যাকটিস', 'অন কনট্রাডিকশন'। অন প্রোপাগান্ডা, 'অন কারেকট হ্যান্ডলিং অব কনট্রাডিকশন, অ্যামং দা পিপল'। আরো যদি সময় দাও, তাহলে ঐ 'ডাস ক্যাপিটল'। অন্তত থার্ড ভলিউম।

—তুই কি তাতে মানুষ হবি?

—হব।

—তাহলে নিয়ে আয় বইগুলো। আজই সুরু হোক।

—এতো সবই রবীন্দ্রনাথের কথারে, তোরা যে বড় ওঁকে বুর্জোয়া বলিস। তোকে তো আমি ঐ রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানে গদ্যেই বোঝাতে পারব।

মুখে কিছু বলি না। কেবল মনে মনে ভাবি, "পুরাণ পুরুষ, গণমানুষ, নারী পুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব অর্থবিহীন হয়ে গেলে,—তবু আরেক নবীনতর ভোরে সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ সঞ্চারিত হয়ে পথে-পথে সবের শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে তবুও কেবল দ্বীপ বানালো যে যার নিজের অবক্ষয়ের জলে। প্রাচীন কথা নতুন করে এই পৃথিবীর অনন্ত বোনভায়ে ভাবছে একা একা বসে রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে: আমাদের এই আকাশ সাগর আঁধার আলোয় আজ যে-দোর কঠিন; নেই মনে হয়; সে-দ্বার খুলে দিয়ে যেতে হবে আবার আলোয় অমার আলোর ব্যসন ছাড়িয়ে"।

—কিরে, কথা বলছিস না যে! পড়েছিস রবীন্দ্রনাথের 'অমৃত', শ্যামলীতে আছে ১৯৩৬-এ লেখা?

—না, পড়িনি।

—জানি তো পড়িসনি, তাই তো সাহস পাস ওঁকে বুর্জোয়া বলতে!··· শোন্—

—বলো! যা বলার এখুনি বলো···

—বলবই তো, তখন থেকে মুখিয়ে আছি। তবে শোন: কবিতাটা মুখস্থ নেই সব। কিছু কিছু আছে। ধর, এক ধনী পুত্র, বড় লোকের ছেলে, আর এক ধনী কন্যা, বড় লোকের মেয়ে। ঐ পুত্র ভালোবাসে মেয়েটাকে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। সে নিয়েই কবিতা। ব্যর্থ প্রেমিক ঐ ধনী বিদায় নেবার আগে কন্যাকে জানায়, ভারতের একজন নারী বলেছিলেন, একদা, উপকরণ চান না তিনি, তিনি চান অমৃত, এই তো নারীর পণ, তুমি কি বল। সে কিছু বলে না। সে কন্যা, অমিয়া, রিয়ালি তাই। অর্থাৎ অমৃত।··· গোড়ার কথা এই, ঐ ধনী পুত্র, অমিয়াকে বিবাহ করতে চায়। অমিয়ার পিতা বলেন, যোগ্যতা দেখাও। দিন যায় রাত যায়, ঐ পুত্রের মাথায় চড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা ঐ যোগ্যতা দেখাতে। "সঞ্চয়ের ধাক্কা যত বাড়ে, ততই তাকে চলে ঠেলে।" থামতে পারে না সে, থামতে পারে না তার তাড়না। বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে। বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে আত্মশ্লাঘা। শেষে তার ডাক্তার বলে, "বিশ্রাম চাই নিতান্তই, দেহের কল অচল হয়ে গেল বলে।"

স্বাস্থ্যোদ্ধারে সে নির্জনে যায়। প্রকৃতিতে। "প্রাণ উঠল দু-হাত বাড়িয়ে জীবনের সাচ্চা সোনার জন্যে।" একদিন কাছের এক গ্রামে, সাঁওতালদের গ্রাম, হাজির হয়। ঐ অমিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। "ছাই রঙের মোটা শাড়ি পরা, দুইহাতে দুই গাছি শাঁখা। পায়ে জুতো নেই, ঢিলে খোঁপা অযত্নে পড়েছে ঝুলে। পাড়াগাঁয়ের শ্যামল রঙ লেগেছে মুখে।" ছোটো ঝারি হাতে পাঠশালার বাগানে জল দিচ্ছিল সবজি-খেতে। ধনীর জামার আস্তিনে ছিল মুক্তোর বোতাম। লুকিয়ে আস্তিনটা দিল সে উলটিয়ে। অমিয়ার জন্যে একটা হীরের ব্রোচ ছিল তার পকেটে। সে বুঝল, দিতে গেলে, হীরেটাতে লাগবে প্রহসনের হাসি।

অমিয়ার ঘরে যায়। চোখে পড়ে, লেখবার টেবিলে একটি ছবি। অল্প বয়সের যুবা। অচেনা। কয়লায় আঁকা। কাঁচকড়ার ফ্রেমে বাঁধানো। ফলাও তার কপাল। চুল আলুথালু। চোখে যেন দূর ভবিষ্যের আলো। ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা আঁটা।

—এ কে?

—মহীভূষণ।

তার আগের কথা হল, আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে মহীভূষণ ফিরেছেন দেশে। বাবা বল্লেন, "বিষয় কর্ম দেখো।" ছেলে বল্লে, "কী হবে।" লোকে বল্লে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোক্কর দিয়েছে রাশিয়ার লক্ষী-খেদানো বাদুড়টা। অমিয়ার বাবা বল্লেন, "ভয় নেই, নরম হয়ে এল বলে দেশের ভিজে হাওয়ায়।" দুদিনে অমিয়া হল তার চেলা। যখন তখন আসত মহীভূষণ, আশপাশের হাসাহাসি কানাকানি গায়ে লাগত না কিছুই।

দিনের পর দিন যায়। অধীর হয়ে অমিয়ার বাবা তুল্লেন বিয়ের কথা। মহী বল্লে, "কী হবে।" বাবা রেগে বল্লেন, "তবে তুমি আস কেন রোজ।"
অনায়াসে বল্লে মহীভূষণ, "অমিয়াকে নিয়ে যেতে চাই যেখানে ওর কাজ।"
অমিয়ার শেষ কথা এই, "এসেছি তাঁরই কাজে। উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।"
—কোথায় আছেন তিনি ?
অমিয়া বল্লে, "জেলখানায়।"

সপ্তম অধ্যায়

আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে

প্রথম নির্বাচন গেল। দ্বিতীয় নির্বাচন আরও বেশি মানবীয় সময় খরচ করে, আরও বেশি বেশি মানুষকে হিড় হিড় করে টেনে, প্রকসিতে, গণ বলাৎকারে সমাধিত হল।
ততদিনে এসে গেছি কোলকাতায়। এম. এ. পড়ছি। নরহরি কবিরাজের কাছে সপ্তাহে একবার যাই। পোলিটিক্যাল ক্লাশে। আমার বরাদ্দ ঐ ক্লাশের বাইরে আমি আরেকজনেরও ক্লাশে যাই, তিনি গণেশ ঘোষ।
মনে আছে খুব, পি. জি. সেলের, নাম করব না, বর্তমানেও বামফ্রন্টের কেউকেটা সি. পি. এম., আমাকে ধমকের সুরে বলেছিলেন, গণেশ ঘোষের কাছে যাও কেন ? অথচ গণেশ ঘোষ, একটুও বানিয়ে বলছি না, গণেশ ঘোষ তখন কমিউনিস্ট পার্টির স্টুডেন্টস' সেলের উপদেষ্টা, বিশেষত ঐ পি. জি. তথা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সেলের।
—জানো গণেশ ঘোষ আন্দামানে ছিলেন আর ঐ একসট্রিমিস্ট গ্রুপের প্রবক্তা ছিলেন! জানো, অতিবামপন্থা দক্ষিণপন্থারই আরেকটা রূপ ? টাকার এপিঠ আর ওপিঠ হল—অতিবাম ঝোঁক ও দক্ষিণপন্থা। ইদানীং ঐ গণেশে লেগেছে অতিবাম ঝোঁক। শোনোনি, আমাদের এই পি. জি.-তে আমরা যে চীপ ক্যান্টিন, চীপ স্টোর্সের উদ্যোগ নিয়েছি, তাতে উনি বুর্জোয়া গন্ধ পাচ্ছেন ? বলছেন, এ দেশের কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা বড় বেশি মধ্যবিত্ত, পেটি-বুর্জোয়া ? ব্যাখ্যা করার সীমা থাকা উচিত! চীপ-ক্যান্টিন, চীপ স্টোর্স নাকি বুর্জোয়া ধ্যানধারণাই পুষ্ট হবে। উনি এই সিলেবাস পোড়াতে চান। এই বিশ্ববিদ্যালয় নাকি রক্ষণশীলতার শেষ দুর্গ, একে উনি ভাঙতে চান। নেহাত উপদেষ্টা বলে। নতুবা কে শুনত তাঁর কথা!
শুনে অবাক হয়ে যাই। সেই নির্মল, সদাহাস্যময়, চিরসংগ্রামী, ধীর, স্থির মানুষটাকে এমন করে কাটাছেঁড়া ? যেন নরহরি কবিরাজের মধ্যে সবই সঠিক। সবই যেন অতি-বাম ও দক্ষিণপন্থা থেকে সম দূরত্বে। হ্যাঁ, তিনি অবশ্য স্বীকার করেন, এই শিক্ষা-দীক্ষা, মেকলে সাহেবের পরিকল্পিত শিক্ষা-দীক্ষা যা পড়ে, শুনে, আমরা আকৃতিতে ভারতীয়, প্রকৃতিতে বৃটিশভক্ত হই। কিন্তু এই কথাটাই আরও লজিক্যালি বলেন

গণেশ ঘোষ। বলেন, এই শিক্ষা-দীক্ষা যে সাম্রাজ্যবাদীর অফিসে কেরানীগিরি করার শিক্ষা-দীক্ষা তাতে তো কোনো ভুলই নেই, কিন্তু এই শিক্ষা-দীক্ষায় শহুরে হাতছানি আছে। গ্রামকে অবহেলা করার মোটিভ আছে। নিজেদের দেশকে ছোটো করে ভাবা, সাহেবদের দেশকে স্বর্গ বলে ভাবার উপসর্গ আছে। তাই দেখো, গ্রামীণ ভারতবর্ষে ঐ শিক্ষা-দীক্ষায় আদ্যন্ত শিক্ষিত হয়ে কী কংগ্রেস কী কমিউনিস্ট সব শহুরে ব'নে আছে। কমিউনিস্টদেরও বর্তমান লক্ষ্য এম. পি. বা এম. এল. এ. হওয়া, তাও গ্রাম ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে না, শহরে থাকার, রাজধানীতে থাকার আহ্লাদে। ঐ দ্বিতীয় নির্বাচন-কালেই আবার এলাকার এম. পি. প্রার্থীর বাড়ি গিয়ে দেখেছি, সবাই উত্তেজিত দিল্লী যাবার জন্য। প্রার্থীর মেজ ছেলে, ক্লাশ টেনে পড়ত, তখন, আমার কাছে জানতে চায়, দিল্লীতে ফ্যামিলি কোয়াটার্স পায় কি না এম. পি.-রা। ওখানকার কলেজে ভর্তি হবার প্রায়োরিটি থাকে কিনা এম. পি. পুত্রের।

কত আর লিখব, প্রার্থীর স্ত্রী তো ধরেই নিয়েছেন, উনি বছরে অন্তত বাদল অধিবেশনে দিল্লী থাকবেন, কেননা প্রার্থীর 'ইউসিনেফোলিয়া' খুব 'হাই', বর্ষায় আরও 'হাই' হয়, টান ওঠে, কাউকে থাকতেই হয়, রাত্রে, বুকে-পিঠে তেল মালিশ করার জন্য।
ভাগ্যি ভালো, প্রার্থী নির্বাচনে হেরে যান।

—তুই সাচ্চা লোকের কাছেই শিখবি ! গণেশ ঘোষকে ছাড়িস না। উনি তোদের মত কমরেড না, উনি বেশি রেড।

ঐ সময়, আমার সঙ্গে মিহির গুপ্তের দেখা হয়। অ্যানাদার একসট্রিমিস্ট। সব লাইনেই অফ-ব্রডওয়ে। যখন সাহিত্য তখন সুবোধ ঘোষ, নরেন মিত্তির, বিমল মিত্র, মনোজ বসু, গজেন মিত্তির ও অনেকানেক বিমল কর প্রমুখ খড়কুটোদের নস্যাৎ করত ঐ মিহির। তেমনি ভয়ংকর আবেগে তুলে ধরত জীবনানন্দ, সতীনাথ ভাদুড়ি, তারাশংকরকে। প্রেমেন মিত্তিরের মধ্যেও দেখত শিল্পবাস্তবতা। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ছিল ইউ. এস. ও.। পরিমল মুখার্জির ইউ. এস. ও. বলা যায়। ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস' অর্গানাইজেশন হবে বোধ হয় ঐ ইউ. এস. ও.। আসলে স্ট্রং অ্যান্টি-কমিউনিস্ট। এবং সশস্ত্র। একদিন আমাকে রিভলবারও দেখায় ঐ মিহির। আমি ঐ মিহির গুপ্তের হাতে পড়ি। সে আমাকে ছাড়ে না কেন যেন। আমাকে ডিবেট করার উৎসাহ দেয়। অশোক ঘোষের বাংলায় বিতর্ক সে সমর্থন করে। অথচ অশোক ঘোষের সংগঠনের (সি. পি. আই.) স্টুডেন্টস' হেলথ হোমকে বুজরুকি মনে করে। বিশ্বনাথনের ইংরেজি ডিবেটের ভক্ত। পরিমল মুখার্জিও ইংরেজিতে কম যান না। বলা যায়, পরিমল মুখার্জির চোস্ত ইংরেজিতে আমিও কম ইনভলভড হই না। এই আমার চরিত্রের দোষ। আমি ধর্মেও থাকি আবার জিরাফেও থাকি। আমি চাঁদেও যে 'দ' লিখি, গোদেও সেই 'দ' লিখি। দেখতে এক। হুবহু এক।

ঐ মিহির গুপ্তের পাল্লায় পড়ে আমি একটা গল্প অব্দি লিখে ফেলি। ঐ প্রথম ও ঐ শেষ। সে গল্প কোথাও ছাপা হয় না। নিজের হাতে কপি করে ঐ গল্প সে বহন করে। একদিন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দেয়। ঐ গল্প এক বেশ্যার কাছে পড়তে বলে। সেখানে আমাকে নিয়ে যায়।

এই বেশ্যার সঙ্গে তাঁর নাকি পূর্ব পরিচয় ছিল। তার বৌদির দিদি নাকি! বিশ্বাস হয়নি। একসট্রিমিস্টরা যখন সিভিল জীবনযাপন করে, তখন তারা স্বপ্ন দেখে খুব। এক ইউটোপিয়ার জগতে বাস করে তখন। অনেক কিছু যেমন রি-কনসট্রাকট করে, তেমনি অনেক কিছু বানায়, কনসট্রাকট করে। ঐ বেশ্যা-বৃত্তান্ত পুরো বানানোই মনে হয়।

তবু সাগ্রহে ওর কাহিনী শুনি। এই বৌদির দিদি একজন সেলস-ম্যানেজারের স্ত্রী। তখনকার 'ফাইজার' কোম্পানীতে কাজ করতেন। বড় রমরমা তখন ঐ 'ফাইজার।' ওঁকে ট্যুরে যেতে হত খুব। ভবানীপুরের বনেদী পাড়ায় বিশাল বাড়ি। দোতলা। এক ছেলে এক মেয়ে। শাশুড়ি আছেন। আর কেউ না। মাসের ২১ দিন স্বামী বাইরে। ভদ্রমহিলা খুব আমুদে। রোজ সিনেমা দেখতেন ম্যাটিনি শো-য়ে। রোজ মানে প্রায়ই আর কি! ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করার জন্য ঐ শাশুড়ি। ছেলে-মেয়েদের প্রতি কোনো নজরই ছিল না বলা যায়। ছেলেমেয়েরাও ঠাকুমার কাছে মানুষ। মাকে বড় একটা আমল দিত না। স্বামী ছিলেন বড় স্ত্রৈণ। স্ত্রীর কোনো বাসনাই অপূর্ণ রাখতেন না। তিনি নাকি মদ খেতেন খুব। শোনা যায় তাঁর নাকি এক সঙ্গিনী ছিল। সম্পর্কে মাসতুতো বোন তাঁর। বর্ধমানে ঐ বোন স্কুলে শিক্ষকতা করত। আর বর্ধমানে ঐ স্বামী মাসের সাতদিন তো থাকতেনই। বোনের ঐ বাড়ি নাকি তাঁরই কিনে দেয়া। বোনের বিয়েই হয়নি। বয়স পেরিয়ে গেছে নাকি। মিহিরের বৌদির দিদির সন্দেহ ছিল না যে ঐ বোনই, তাঁর, মাসে সাতদিন, শয্যাসঙ্গী হয়। একবার নাকি এক চিঠি পেয়েছিল বিয়ের আগে লেখা। সে চিঠি কেবল শয্যাসঙ্গীকেই লেখা যায়। কোনো লাগাম ছিল না লেখায়। সে চিঠি বিয়ের সাতদিনের মধ্যে পেয়ে, দেখে, বৌদির দিদি বড় অনর্থ করেছিলেন। পরে কি হয়েছিল জানে না মিহির। কেবল এই জানে যে, সে, ঐ বৌদির দিদি, নিজের জগতে বড় আমোদে থাকতেন। সর্বদা মুখে পান। ঐ পানে নাকি আনন্দ মোনাক্কা থাকত। আনন্দ মোনাক্কা নাকি একধরনের sex booster—মদনানন্দ মোনাক্কা। প্রায়ই মিহিরদের বাড়িতে আসতেন। আর মিহিরের কাছে উপন্যাস চাইতেন। যে-সে উপন্যাস নয়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুষ্কোণ, নবেন্দু ঘোষের সব উপন্যাস, মাদাম বোভারি, আনা কারেনিনা, স্কারলেট অ্যান্ড ব্ল্যাক। মিহির তৎপরতার সঙ্গে জুগিয়ে যেত। এক একটা বই হাতে নেন আর মিহিরের গাল টিপে দেন, খুব পাকা হয়েছ তো! একদিনেই সংগ্রহ করলে। পড়েছ নাকি?

একদিন নাকি চূড়ান্ত হল। উনি কড়কড়ে একশ টাকার নোট মিহিরের হাতে দিয়ে

নাকি, বল্লেন, কলেজ স্ট্রীটে প্রেসিডেন্সি কলেজের ফুটপাতে, যেদিকে ওয়াই. এম. সি. এ. সেদিকে লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লি'জ লাভার' পাওয়া যাচ্ছে, ব্ল্যাকে, কিনে আনতে পারলে, তোমাকে এমন এক জিনিশ দেবো, ভাবতেই পারবে না। আজই যাও, নিষিদ্ধ বই তো, উবে যেতে পারে, দরাদরি কোরো না, হৈ-চৈ কোরো না, যা দাম চাইবে এককথায় দিয়ে দেবে। যতদূর শুনেছি, পঞ্চাশ টাকা দাম।

১৯৫৩-র কথা। তখন পঞ্চাশ টাকা মানে কত, সেটা বুঝবার আগে বুঝুন, ঐ সময় শ্যামবাজার থেকে ইউনিভার্সিটি আসা যেত এক আনায়, এখনকার ৬/৭ পয়সায়। ভাবা যায়? ভাবা যায় ৫০ টাকা মানে কি?

সেদিনই আরেক কাণ্ড করলেন ঐ মহিলা। মিহিরের মাকে, নিমন্ত্রণ করলেন, পরের দিন দুপুরে। মিহির নিয়ে যাবে ও মিহিরও দুপুরে খাবে, প্রকাশ্যে বল্লেন। উঁচুগলায়।

আর নিচুগলায় মিহিরকে ফিসফিস করে বল্লেন, ঐ বই কাল দুপুরেই নিয়ে যাবে। না হলে অনর্থ করব। পেটে গুঁজে নিও, পেট থেকে আমি নিজে বার করে নেব। রাত্রে মোটে পড়বে না ঐ বই।

মিহির নিয়ে নাকি গিয়েছিল ঐ বই। ঐ পেটে গুঁজে। সঙ্গে ধর্মের সাক্ষী ঐ মাও ছিলেন।

চোখাচোখি প্রথম হলে নাকি, ইঙ্গিতে পেট দেখিয়েছিল মিহির।

সবই বানানো। তবু ঐ বানানো কথাই লিখে যাচ্ছি বিশেষ এক কারণে। মিহিরের কথা লিখছি ঐ একই কারণে।

তার পরের ঘটনা বড় ক্ষিপ্র, কম্পিত। মিহির যত ইঙ্গিত করে এখুনি বইটা নেয়া হোক, তত মহিলা ইঙ্গিত করেন, পরে।

সেই পরে আসে খাবার পর। মিহিরের মাকে শাশুড়ির কাছে আহারান্তে ভিড়িয়ে দিয়ে ঐ মহিলা প্রকাশ্যে মিহিরকে বলেন, চলো, ওপরে চলো, রেকর্ডে গান শুনবে। তুমি ঘুমোও নাকি দুপুরে?··· ভালো, আমিও ঘুমোই না।

প্রকৃতই ওপরে উঠে লং প্লেইং ৩৩⅓ আর. পি. এম.-এ রেকর্ড চালান। বড়ে গোলাম আলির ঠুংরী। হাই টোনে। সবে বেরিয়েছে ঐ রেকর্ড প্লেয়ার। নিজের শোবার ঘরে তখন। কেবল তারা। ছেলেমেয়েরা স্কুলে। শ্বাশুড়িরা নীচে। দুজনেই লোলচর্মী। কানের মাথা খেয়েছেন। চোখেরও। ধান শুনতে কান শোনেন আর কান দেখতে পান দেখেন।

সুতরাং ওপরে, বন্ধ শোবার ঘরে লেডির লাভ সীন অবাধ হয়।

সে যে কি ক্রাইসিস, আজও, মিহির, ভাবলে নাকি মূর্ছা যায়।

ঐ মহিলা এখন নাকি অনন্যোপায় হয়ে, স্বামী-পুত্র-কন্যা ছেড়ে সদর স্ট্রীটে অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছেন। এমনি তাঁর প্রবৃত্তি।

সেখানেই গেলাম মিহিরের সঙ্গে একদিন দুপুরে।

উনি ঘুমুচ্ছিলেন। নিদ্রাজড়িত তাঁর ঐ রূপ জীবনে ভুলব না। পরণে নাইটি। মাথায় চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। কপালে কয়েক গুচ্ছ চুল চোখে মায়া রাখছে খুব।

উনি মিহিরকে, আমার সামনে, টেনে নিজের কাছে নিয়ে, ভর্ৎসনা করলেন মৃদু, আসার আর সময় পেলে না ?

—বাঃ, তাই বলে সন্ধ্যায় আসব নাকি ?

—বেশ করেছ, ও কে ?

—আমার বন্ধু, তুমি গল্প ভালোবাসো, ও খুব ভালো গল্প জানে, গল্প লেখেও, একটা লেখা গল্প পড়বে তোমার কাছে।

—বাঃ বেশ। এসো।

ভিতরের ঘরে নিয়ে যান। শোবার ঘর। বিশাল খাট। ডিভান টাইপ। চমৎকার ধবধবে শাদা চাদর ঢাকা। ইতস্তত তাকিয়া, শাদা কভারের। এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা সেন্টার টেবিলে। শাদা।

উনি গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে আমাদের জন্য চা আনলেন।

তারপর শুয়ে পড়লেন। জোর করে আমাদের কাছে নিলেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে বসি।

—যাঃ মুখচোরা ছেলে, পায়ের কাছে বসে নাকি ? এসো, উঠে এসো। যাই না। চকিতে উনি উঠে আসেন আমার দিকে। আমি ভয়ে, 'দিদি' বলি।

—নাও পড়, তোমার গল্প, আমি মুখোমুখি শুনব। মোটে দিদি ডাকবে না আমাকে। …নাও পড়।

গল্প পড়ি। মনে আছে, গল্পটার নাম 'ব্লাড' ছিল। স্বামী-স্ত্রীর গল্প। ওদের বিবাহবার্ষিকীর গল্প। সকালে উঠে দুজনেই দুজনকে গোপন করে বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন করে। সেদিন ঝগড়া করে না। যে কেউ অপরের কথায় কনট্রাডিকট করে না। বেশ কাটে। বাজারে যাবার কথা হয়।

স্বামীর ইচ্ছা, ইলিশ মাছ আনে, স্ত্রী ভালোবাসে। স্ত্রীর ইচ্ছা, মাংস আনুক সে, সে ভালোবাসে।

—দাঁড়াও লিস্ট করে দি'। টাকা আছে তো কিছু ?…তাহলে তো ভালোই। বাজারের লিস্ট হয়। কোনোমতে তা পকেটে পুরে স্বামী যায়। যার পকেটে তখন মাত্র দেড় টাকা।

স্বামীর এক রোগ আছে। দু'হাতে কনুই পর্যন্ত এবং দু'পায়ে গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত, চাক চাক নীল দাগ। ডাইমেনশন আছে। চুলকায় খুব। চুলকালে শাদা খড়ির মত হয়ে যায় ঐ নীল।

স্বামী যায় মেডিক্যাল কলেজের কাছে। ডাক্তার বলেছেন, ঐ স্কিন-ডিজিজ লিভারের জন্য। ইনফেকসাস নয়। এই আশ্বাসে সে মেডিক্যাল কলেজের সামনে ব্লাড-ব্ল্যাকার ধরে। তারা অন্যত্র তাকে নিয়ে তার ব্লাড টানে এক বোতল। দশটাকা দেয়। ১৯৫১-র দশটাকা।

তাতে সব হয়। এমনকি একগুচ্ছ রজনীগন্ধাও হয়।

ফিরে আসে ঘরে।

—বাব্বাঃ, আজ দেখছি পুরো লিস্ট অনুযায়ী বাজার।

এতক্ষণে খেয়াল হয় স্বামীর। সে ঐ লিস্টের কথা ভুলেই গিয়েছিল। আসলে বোতলে লালরক্ত দেখে তার বড় বরাভয় জেগেছিল। সে ভেবেছিল, নীলরক্ত হবে। অলীক ভাবনা। তবু ভেবেছিল।

সে কৌতূহলে বাথরুম যায় ঐ জামা-কাপড় পরেই। বাথরুমের প্রায়ান্ধকারে সে দেখে ঐ লিস্ট। লিস্টের শেষ লেখা, রজনীগন্ধা।

—দারুণ, নাও, পুরস্কার স্বরূপ এই রজনীগন্ধা নাও। গল্পের নাম রজনীগন্ধাও হতে পারত। এই নাও!

হাতে নি' ঐ গুচ্ছ। উনি ঢলে পড়েন আমার বুকে। রজনীগন্ধা চেপটে যায়।

—বড় লাজুক তুমি। এদিকে তো নারীর নাড়ি-নক্ষত্র জানো। নটি বয়। আমি লজ্জিত হই। উনি মিহিরকে নিয়ে পড়েন।

আমি ঘর দেখি। দেখি চতুর্দিকের দেয়ালে তাঁরই ফোটো, ছবি। নানা ঢঙে, নানা রূপে। কতগুলো ছবি বড় ফ্র্যাঙ্ক। তাকাতে পারি না।

একটি ছবির দিকে চোখ যায়। দূরের দেয়ালে আঁটা। উনি দাঁড়িয়ে আছেন। এক দিকে ছেলে, অন্যদিকে মেয়ে। দেখে হতবাক হই।

ছবিটার কাছে যাই। ওনার সঙ্গে ঐ ছবির মহিলার মিল আছে, আবার মিল নেই। তবে বুঝতে বাকি থাকে না যে, এ ছবি ওনারই। ঐ ছেলেমেয়ে ওনারই।

—কি দেখছ? ঐ ছবির কেউ বেঁচে নেই।

আমি মিহিরের দিকে তাকাই। তার কৌতুকের হাসি দেখি। পরক্ষণেই অপার দুঃখ দেখি।

এই মিহিরকে আমি ভালো বুঝতে পারি না। সে এমনিতে একসট্রিমিস্ট, কিন্তু বড় ভায়োলেন্ট। তার ভায়োলেন্সের মধ্যে আমি কেন যেন এগজিবিশনিজম দেখি। দেখে বড় কষ্ট হয়। আমাকে যে রিভলবার দেখায়, সেটা বাস্তবিক কোবাল্ট। খেলনার নয়। তাতে কিন্তু টোটা ছিল না। অথচ এমন করে আমাকে টার্গেট করেছিল ট্রিগারে তর্জনী দিয়ে যে আমি ভয়ে হিম হয়ে গিয়েছিলাম।

দোষের মধ্যে আমি তখনকার বি. পি. এস. এফ.-এর পি. জি. সেলের সি. সি.-তে নির্বাচিত হয়েছিলাম।

আমার এই উচ্চাভিলাষ কেন ? আমাকে ঐ বি. পি. এস. এফ. ছাড়তে হবে। আমি অবশ্য নতিস্বীকার না করাতে সে আমাকে বাহবা দেয় শেষ পর্যন্ত। অন প্রিন্‌সিপল্‌. একসট্রিমিস্টরা নতিস্বীকার করে না, কেউ নতিস্বীকার করলে ঘৃণা করে তাকে। উপহাস করে। কেউ নতিস্বীকার না করলে তাকে বাহবা দেয়।

ঐ মিহির আমাকে আরেক বেশ্যার কাছেও নিয়ে যায়। দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটের কনভেনশনাল বেশ্যার কাছে। তার নাম মনে আছে, বীণা। এই বীণার কথা কোথায় যেন পরে পড়ি। সুনীলের 'আত্মপ্রকাশ'এ কি, না সন্দীপনের 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য'তে ? মনে পড়ে না। সেই বীণাকে, সে, প্রথমে, আমাকে দেখায়, ফুটপাথে। সেদিন আবার বুলগানিন-ক্রুশ্চেভ কোলকাতায় এসেছিলেন। সেই সূত্রে সে আমাকে ছিনিয়ে নেয় কলুটোলা স্ট্রীটের জমায়েত থেকে মহম্মদ আলী পার্কের দিকে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ঐ যে মন্দির দেখছ, ওখানের ফুটপাথে যারা লালপেড়ে গরদে দাঁড়িয়ে আছে তারা সবাই রেড-লাইট এরিয়ার। ওখানে ঐ যে দেখছ ঘোমটা পরা চওড়া লাল পেড়ে গরদে আড়াল করছে মুখ, সে বীণা। আজ তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব।

—বাঃ, বুলগানিন-ক্রুশ্চেভের মিটিঙে যাব না ?

—যাব—তবে ঐ বীণায় কিছু টাচ দিয়ে।

যাই। সে বড় বিচিত্র জায়গা। দোতলায় উঠতে হল সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে। ঐ ১২টায়। তখন সবে বীণা শুয়েছে। উঠে বসে। তার চতুর্দিকে বাসি রজনীগন্ধা। চোখের কোলে কালি। সাংকেন আইজ। কিন্তু খুব আপ্যায়ন করে। আমি বরাবরই অভিভূত হই দ্রুত।

সেদিনও হলাম। বল্লাম, আপনারা দাঁড়িয়েছিলেন ফুটপাথে, দেখেছি, কিন্তু কেন দেখতে গেলেন বুলগানিন-ক্রুশ্চেভকে।

—বাঃ, দেখব না, ওদের দেশে নাকি আমরা কারখানায় কাজ করি, রেলগাড়ি চালাই, ক্রেশের সিসটার হই, দেখব না ?

—কি দেখলেন ?

—দেখলাম আমাদেরি মতন। তবে সাহেব। ভাবিনি, ওঁরাও সাহেব হবেন। কোট-প্যান্টে ফিটফাট। সাহেবরা তো খারাপই হয়।

—বাঃ ওরা কি সেই সাহেব ? ওরা তো শ্রমিক। আর আপনারাও তো শ্রমিক।

—না, শ্রমিক না।

—শ্রমিকই তো, আপনারাও তো শ্রম বিক্রি করেন।

—শ্রম না, দেহ বিক্রি করি। যতক্ষণ ক্রেতার কাছে থাকি, ততক্ষণ ঐ ক্রেতার কাছে আমরা ক্রীতদাসী। আমাদের এই দেহটা নিয়ে মজার সব কাণ্ড করেন। বুড়োরাই বেশি করেন। তোমাদের মতন যখন কেউ আসে, তারা কেবল বুক দেখতে চায়—আর

বুক দেখাবো কি করে, সে কি আর আছে ? সে যে কবেই নুয়ে পড়েছে। তাছাড়া দেখো, আমরা পুরো ক্রীতদাসী, আমাদের যত বয়স বাড়ে, তত রোজগার কমে। আমাদের কোনো রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট নেই। বড় জোর মাছ বেচতে পারি হাতিবাগানে। **পেনশন পাই না।**

শুনে আমি হতবাক হই। কোনোদিন ভাবিনি তো, বৃদ্ধা অথবা প্রৌঢ়া বেশ্যার কথা !

মিহির আমাকে জানায় কার্তিক পুজোর দিন আবার আনবো তোকে, এখানে, তখন মজার জিনিশ দেখবি, কার্তিক লড়াই। সরস্বতী পূজার দিনও আনব, সরস্বতী তো স্বর্গের বেশ্যা, অথচ দেখ, উনিই বিদ্যাদায়িনী। নে, শেখ, তোর যা কিছু শেখার, এই বীণাদের কাছেই শেখ।

আর যাওয়া হয় না। বীণাদের কাছে আর যাওয়া হয় না। মিহির হঠাৎ ডুব মারে। আমি আর জীবনে রজনীগন্ধা সহ্য করতে পারি না।

তাকে, ঐ মিহিরকে পুনরায় দেখি বরাহনগরে। ঐ নকশাল আমলে। চোখে কালি। রোগা লিকলিকে। চোখ দুটো অসম্ভব লুম্পেনী। ঘরে ঘরে টেকসই যুবাদের খুঁজছে। টেনে বার করে এনে এক আঘাতেই মেরে ফেলছে। আমি ওর হাতে পড়ে বেঁচে যাই। আমাদের হাতে পেয়ে ও চিনতে পারে, আহাম্মক কোথাকার ! এখানে ভিড়েছিস কেন ?

এই হল একসট্রিমিস্ট। আজ অতিবামে আছে, কালই অতিদক্ষিণে চলে যাবে।

অষ্টম অধ্যায়

হয়তবা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিম কথা

১৯৫৮-তে আমার বিয়ে হয়।...
এই বাক্য লিখে কিছুক্ষণ আমি আর লিখতে পারি না।
কেবল তাকিয়ে বাকি বাক্যটার দিকে। অনিমেষ।
একসঙ্গে অনেকগুলো কথা মনে পড়ে যায়।
মনে পড়ে যায়, Marriage is a legal prostitution.
এ কথা আমার বাসর ঘরেও মনে হয়েছিল।
যখন বেনারসী স্ত্রীকে আমি বিনাভূমিকায় বিবসনা করি। কত যে সেফটিপিন ছিল, ঐ কনেসাজে, কি আর লিখব ! গুণে শেষ করতে পারি না। সবই বালিশের তলায় তলায় রাখি। সায়ার দড়িতে বিষ গিট। আমাকে ছিঁড়তে হয়। শিয়রে রজনীগন্ধা ছিল। আমাকে সরাতে হয়। তখনি আচমকা ঐ রজনীগন্ধা তথা Marriage is a legal prostitution মনে পড়ে যায়।

আমি আমার পোটেন্সি হারাই। কার্যত যা বলাৎকার, তা মাটি পায় না। শেষরক্ষা হয় না।
ঐ সুরু।
আমি বাস্তবিক আর পোটেন্সি পাই না। যতটুকু পাই, তাতে স্ত্রীর চিড়ে অন্তত এক ফোঁটাও ভেজে না। আমার কথা আলাদা। ঐ রজনীগন্ধা, অন্য সময় দম বন্ধ করে, এই সময় দিল খুলে যায়। পোটেন্সি পাই না মানে, আমি দ্রুত ফুরিয়ে যাই। উপসংহারে, তখন, তার চোখ ভিজে যায় গ্লানিতে। অতৃপ্তিতে। তার নাকি ভিতরটা শুকিয়ে যায়।
স্ত্রী যখন আমার প্রেমিকা হয়েছিলেন, সে বড় সুন্দর কথা।
হল কী একদিন, ইউনিভার্সিটিতে নাম্বুদিরিপাদ এলেন। লনে সভা। ক্লাশ থেকে ঝেটিয়ে নিয়ে আসছি সকলকে। দেখি সে দাঁড়িয়ে। ঠোঁটে প্রত্যয়। চোখে চশমা। চিনি না। বল্লাম তবু, লনে চলুন।
দেখি, তবু সে দাঁড়িয়ে। তখন ওর হাত ধরতে বাকি রাখি। বল্লাম, আপনার সাবজেকট ?
—বাংলা।
—ও, তাহলে তো আমার ক্লাশ মেট আপনি। কি 'বি' সেকসনে ? আমি ; 'এ'।
—আমার ফিফথ ইয়ার। ফিফথ ইয়ার 'এ'।
—ও, তাহলে তো আপনি আমার অনুজা।
দেখি ঐ অনুজা শব্দে সে আটকে যায়।
এই আমার গুণ, কখনো-সখনো ওরকম উপযুক্ত শব্দ আমি প্রয়োগ করতে পারি। আমি কখনো 'বিয়ে' বলতাম না তখন, বলতাম, বিবাহ। শুনে মেয়েরা চমকাতো। তো, ঐ বিবাহেরই সোহাগ লাগল ঐ অনুজায়।
সে আসে ঐ লনে। আমি মাঝে-মধ্যেই তাকে দেখতে পাই। সে আমারই দিকে তাকিয়ে।
আমি সিনিক বলে কথিত। তবু ঐ চোখ, যা কেবল স্নানান্তেই স্নাত হয়ে দিনমান ঐ অটুট স্নাতই থাকে। আমি, কি বলব, নাম্বুদিরিপাদের সব কথায় মন দিতে পারি না। একে ইংরেজি, তারপর সে ; সে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়েই থাকে। বিশ্বাস করুন, আমার পানে তাকিয়েই থাকে।
এমনিতে আমি দেখতে ভালো না। উল্লেখ্য তো নয়ই। তবু ঐ তাকিয়ে থাকায় আমি রূপবান হতে থাকি। আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে, আমিই জানি, আর জানে সেই মেয়ে।
আরেকদিন দেখা হয়।
সেদিন দ্বারভাঙা হলে হীরেন মুখার্জি ও অম্লান দত্তের একজিবিশন ডিবেট। বিষয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বনাম ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি।

দেখি সে পিছনের সারিতে, দাঁড়িয়ে। আমাকে খুঁজছে। টের পাই, যখন আমাতে এসে ও থামে।

দেখা হয়, কলুটোলার মোড়ে একদিন সেন্ট্রাল এভেন্যুয়ে। ট্রপিকালের বাস-স্টপে। আমি যাচ্ছিলাম হরবোলায়। এলগিন রোডে। সিগনেট প্রেসের বাড়িতে।

ডি. কে., দিলীপকুমার গুপ্তের মজলিশে, হরবোলায়। যেখানে কমলকুমার মজুমদার ও তাঁর কিংবদন্তীর 'ঢ্যাঙা' মানিকদাও আসেন। দীপক মজুমদার, সেই অবিস্মরণীয় নাটক 'বেদনার কুকুর ও অমল' প্রণেতা আসতেন ; আসতেন সেই 'আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে'র শক্তি, সেই কবি, কবিদের ক্যাপ্টেন সুনীল গাঙ্গুলিও আসতেন। যাচ্ছি সেই মেজাজে। দেখি সে দাঁড়িয়ে কলুটোলার মোড়ে সেন্ট্রাল এভেন্যুয়ে। একই বাসে উঠি।

লেডিজ সীটে, টু সীটার, বসতে পায় সে, পাশের সীট ফাঁকা। সে জানালার ধারে। আমাকে বসতে বলে ঐ টেম্পোরারি সীটে তার পাশে সেই সীটে যা টেম্পোরারি ফর জেন্টস। আমি জাস্ট জেন্টলম্যানের মতো ওর পাশে বসি।

—আপনি সাউথে থাকেন ?

—না, না, আমি নর্থে। ইউনিভার্সিটি হলে।

—এদিকে ?

—এই এলগিন রোডে। আপনি ?

—বাড়ি ফিরছি ?

—কোথায় ? ভবানীপুরে ?

মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।

—হ্যাঁ, ভবানীপুরেই, জানেন নাকি ?

—না, না, জানবো কি করে ? আমি কি গণৎকার ?

—বলতে তো পারলেন !

—সে আপনাকে দেখে। ভবানীপুরের মেয়েরা আপনার মতো হয়।

—মানে ?

—বনেদী। আর চশমা পরা। সুশোভন সরকারের মেয়েকে জানি ঐ ভবানীপুরে।

আমরা, আশ্চর্য, একই স্টপে নামি। নামার পূর্বমুহূর্তে সে টিকিট কাটে। কনডাকটার কড়কড়ে একটাকার নোট ওর হাত থেকে পেয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে, তার দাঁড়ি-গোঁফে অশৌচ মুখে, কিছু হাসে, বড় সুন্দর, বলে, কী দুটো ?

সে নির্মল সম্মতি জানায়।

কিছুর মধ্যে কিছু না, আমি সহসা ভাবি, এক থেকে দুই। এক প্লাস এক, তবু দুই না, এক। একটাকার নোটে দুটো টিকিট। অথবা দুটো টিকিট একটাকার নোটে।

দুই=এক। একাঙ্গীকরণ। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি। না কুঁড়ি হবার কথা, তখন আসে না।

সে, নেমে, ডানদিকে যায়, আমি বামে।

যাবার আগে আমাদের ঠিকানা বিনিময় হয়।

অবিশ্বাস্য মনে হবে, তবু পরের দিনই, ইউনিভার্সিটি যাবার আগে, হস্টেলের লেটার বক্সে একটা নিটোল খাম দেখি। ছিমছাম খাম। গোল গোল অক্ষরে আমার ঠিকানা। সঠিক মুক্তো। অক্ষর যেন হরিণ খুরাকৃতি। ঝর্ণার জলে স্নান করছে ছিমছাম, গোল গোল। ধারে কাছে বাঘ নেই। সকলি স্নিগ্ধ। সকলি নবীন। সকলি টেনডার। অ্যান্ড টেন্ডার ইজ দা নাইট। যত রাত হয়, তত ঐ চিঠি আমাকে জাপটে ধরে।

ওর পত্র তখনো তো স্ত্রীর পত্র নয়।

লিখেছিল, অনেক কথার পর ঐকথা লেখে, আসুন। অবশ্য প্রথমত ছিল ঐ অনুজ্ঞা, দ্বিতীয়ত ছিল ঐ অনুজ্ঞা, তৃতীয়তও ছিল ঐ অনুজ্ঞা, এমনকি শেষ পর্যন্তও ছিল ঐ অনুজ্ঞা। এসব কথার পর ঐ অমোঘ কথাগুলো আসে, **আমি সাজতে ভালোবাসি**। আপনি, মোটে নিজেকে সাজান না। ভাবি, আপনি আমার চশমাকে মেনে নিয়েছেন। ওটাই আমার একমাত্র ক্লামজি এফেয়ার। আসবেন, অনুগ্রহ করে সেজে গুজে, একদিন, আমাদের বাড়ি। মাকে আপনার কথা বলেছি। মা আপনাকে দেখতে চান। তারপর, আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাব। যেখানে নিয়ে যাবেন। চশমা পরব না।

যাই। আর সঙ্গে সঙ্গে অবিস্মরণীয় এক মাকে দেখি। যেন আমারই কাঙ্ক্ষিত মা। বিধবা। সে অবশ্য নীল জর্জেট পরেছিল। প্রসাধন ছিল না। কেবল চোখে মৃদু কাজল ছিল। আঃ, সেই বাল্যকালের নীল। ধবধবে শাদা মায়ের পাশে চির-লীলাত্মক নীল, উজ্জ্বল নীলমণি।

আমরা লেকে যাই।

কোনো কথা হয় না। সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। রাত্রি আসে। কোনো কথা হয় না।

একসময় ওর হাত আমার হাতে দেখি, বড় নিবেদিত যেন। অধিকন্তু বড় তৃষ্ণার্ত। কামার্ত বলা যাবে না তখনো। তবু ভারচুয়াল কামার্ত।

এই সুরু। বড় দ্রুত সুরু।

আমি যেমন সব কিছু দ্রুত করি, তেমনি। দ্রুত অভিভূত হই। দ্রুত ক্রুদ্ধ হই, দ্রুত বিপ্লব করি, দ্রুত ফলপ্রসূ হতে চাই। দ্রুত পদস্খলন হয়। দ্রুত সহবাস করি। করতে ইচ্ছা যায়। শেষরক্ষা হয় না। প্রকৃতি, তুমি আমাকে এই সুসময়ে এমন করলে কেন ?

একদিন প্রমাণ হয়, what is what.

সেদিন সে স্নেহময়ী ছিল। ইলিশ মাছ ভাতে দিয়েছিল। কলাপাতায় খেতে দিয়েছিল। ইলিশ মাছের গাদা ভেজেছিল। শুকুলংকা ভাজা করেছিল। ইলিশ মাছের তেল দিয়েছিল।

তেল দিয়েছিল।

এসব আবার রাত্রে হয়। এই তেল।

—ইলিশ কোথায় পেলে ?

—কাটোয়ার এক মাছওয়ালা এসেছিল। বিকেলে। শেষরাত্রের কাটোয়ার গঙ্গায় ধরা ইলিশ। অনেকগুলো গামছা দিয়ে ঢেকে এনেছিল। প্রতিটি ইলিশ, শুনলে অবাক হবে, কুমড়ো পাতায় জড়িয়ে এনেছিল। বড় বড় কুমড়ো পাতা। মাছ ভালো থাকে নাকি। আমি চারটে পাতা নিয়েছি, এমনি দিয়েছে।

—পাতা ?

—হ্যাঁ, পাতা, পাতায় জড়িয়ে ঐ ইলিশ ভাতে, জানি না, ভালো হবে কিনা !

মাকে দেখেছি রাঁধতে, অমৃত। কৈ, এসো। কি ?

—...।

—আজ কত তারিখ জানো ?

জানি, আমাদের তৃতীয় বিবাহবার্ষিকী। আমি গোপনে আমার প্যান্টের পেটে লুকিয়ে এনেছি নাইটি। বলেছিল সে, রাত্রে নাইটি পরায় সুবিধে অনেক। তখন গা করিনি। বাজারে গিয়েও না। ইচ্ছে ছিল, সেন্ট কিনব। ল্যাভেন্ডার। ল্যাভেন্ডারের গন্ধ আমার ভালো লাগে। আনন্দময়ী মা আমার, আমাকে দিয়েছিল বিবাহে।

যে বিবাহ একপ্রকার তাঁরই দেয়া। কিন্তু সে কথা এখন না।

ঐ ল্যাভেন্ডারের শিশি বড় মজার ছিল। শিশির ছিপি এক পরী বিশেষ। ডানা আছে। ঐ ডানা ছড়ানো, যেমন থাকে ডানা। ঐ দুটো ডানা এক করলে ঝর্ণার মত সুগন্ধী রেণু স্প্রে হয়। প্রথম দিনই ঐ কাণ্ড করতে সে, স্ত্রী, হাত থেকে ছিটকে দূরে নিক্ষেপ করেছিল। ভেঙেছিল।

—বাঁচা গেল !

—কেন ?

—ল্যাভেন্ডারের গন্ধ আমি মোটে সহ্য করতে পারি না। মাথা ঘোরে।

ঐ ল্যাভেন্ডার আমার স্টিমিউল্যান্ট, কিনতে ঐ স্মরণ। তখন নিজের অজান্তে ফুটপাথে এক ঝুলন্ত ল্যাভেন্ডার ফুলের হালকা বেগুনি রঙের নাইটি দেখি। দাঁড়িয়ে পড়ি তার সামনে। নাইটি হাওয়ায় দুলছিল। অভ্যন্তরে স্পষ্ট স্ত্রীকে দেখলাম।... কী আশ্চর্য, কোন দরাদরি না করে, কিনি ঐ নাইটিই।

চর্বচোষ্য খেয়ে শুতে যাই। দেখি, শিয়রে রজনীগন্ধা। ততমধ্যে তার ঐ নাইটি পরা সারা। দাঁড়িয়ে আছে। উদ্যত গ্রীবা। ঠিক যেন ম্যাডোনা।

—খুব সারপ্রাইজ দিলে যা হোক। নটি বয়।
হায়, ঐ নটি বয়। মিহিরের বৌদির দিদি সদর স্ট্রীটের অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে ঐ ফস্টিনস্টি সুরু করেছিলেন। যার অন্তিমে ঐ নটি বয়।

কোথায় আমার পোটেন্সি যাবে, দেখি উল্টে পোটেন্সি আসে দিকবিদিক কাঁপিয়ে। হায়রে প্রবৃত্তি, তোমাকে কোনোদিনই বোঝা হল না আমার। চেনা হল না।

সে দাঁড়িয়ে থাকে নাইটি পরে। আমি রজনীগন্ধার সুবাস পাই। যা ছিল অবদমিত, তাই উদ্যত হয়। তবু নড়তে চড়তে পারি না। পেটে যেন খিল চেপে থাকে প্রবৃত্তি। মেরুদণ্ডেও খিল। অর্গল। কেউ খুলতে চাইছে। সে ঝপ্ করে মশারী ফেলে। অবলীলায় ঢুকে যায় ভিতরে।
—কৈ এসো।
আমি যাই। সে অপাঙ্গে টেনে নেয় আমাকে।
—নটি বয়!
—দিদি!
—ও আবার কি?
— ...
আমি এক হাতে রজনীগন্ধা ধরি। অন্যহাতে ওর নাইটি নামাই।
হায়, শেষপর্যন্ত আমার পোটেন্সি বাড়ায় ঐ দিদি।
—মোটে দিদি ডাকবে না আমাকে।
হায়, এ বাক্যও সে বলে।

কী, খুব সুন্দর কথা তো! সে বড় সুন্দর কথা, হতে পারতো তো?
এখন সে পাশ ফিরে ঘুমায়।

এখন বুকে কান্না জমলে কার লাভ? অথবা সে, প্রাণভোমরা, যদি টিপে মেরে ফেলি, তবে কার লাভ? যদি প্রোজেকশন হয় পলিগ্যামিক, তবে কার লাভ? শেষপর্যন্ত কার লাভ?

আহা, ও যে কারুর দিদি নয়। ও ছোটো বোন। ওর তিন দাদা, এক দিদি।
ওদের পরিবারে টিচার নেই। সব্বাই একজিকিউটিভ।

আমার এই কাহিনী পড়ে, যে কেউ বলবেন, তুমি নরকের কীট হবে।
হ্যাঁ, আমি নরকের কীট। নরকে এক ঋতু চলছে আমার। নরক তো যুধিষ্ঠিরও দেখেছিলেন। দুর্যোধন দেখেননি।
আমি আমার মা আনন্দময়ীকে বলেছিলাম তার ঐ প্রথম চিঠির কথা। উনি দেখতে চেয়েছিলেন, ঐ চিঠি। দেখাতে পারিনি।

একবার আমার মারাত্মক ফ্লু হয়। সেই ঐতিহাসিক '৫৬-র ফ্লু। সারা কোলকাতা জ্বরে পড়ে।
আমি বেহুঁশ।
হঠাৎ একদিন দেখি, হস্টেলে আমার রুমে, আমার শিয়রের কাছে দাঁড়ানো, ঈষৎ নত আমার মুখের পরে, আমার মা আনন্দময়ী।
—ওকে খবর দিসনি ?
— ...
—আমাকেই বুঝি খবর দিতে হবে ?
ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওকে ধরে নিয়ে আসেন মা আনন্দময়ী।

ঐ যে ওকে ধরলেন উনি, আর ছাড়লেন না। আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তবে ছাড়লেন।
আমার বিবাহের ১০ বছর পর মা আনন্দময়ী বিবাহ করলেন এক টিচারকে। তখন আমার ত্রিশংকু অবস্থা। তখন দাবানল। তখন বলা বাহুল্য ১৯৬৮।

মা আনন্দময়ী আমাকে ছেড়ে চলে যান। আরও দূরে। কুচবিহারে।

যাবার আগে তিনি এক মস্ত ভুল করেন। স্ত্রীকে এক পত্র দিয়ে যান। সে পত্র আমি দেখিনি। বস্তুত সে দেখায় না। তবে মাঝে-মধ্যে ঠেঁশ দিয়ে ঐ মা আনন্দময়ীর কথা বলে।
—তোমার তাহলে আনন্দময়ী ছিল !
—কে, কে বলেছে ?
আমি চমকে উঠি।
—স্বয়ং উনি জানিয়েছেন চিঠিতে।
—কৈ ? দেখাও তো।
—না, সে চিঠি আমাকে লেখা, পার্সোনাল। চিঠি দেখে কি হবে ? আনন্দময়ী তাহলে ছিল তোমার ! তাহলে মরতে আমাকে বিয়ে করতে গেলে কেন ? আর উনিই বা আমাকে সিলেকট করলেন কেন, তোমার বউ হতে ?
—জানি না।
—জানো ভালোই। এখন মুখ ফুটে বলছ না। বুঝতে পারছি না, তিনিই বা কেন তড়িঘড়ি তোমার বিয়ে দিলেন আর বিয়ে দিয়ে তিনিই বা কেন নিজে বিয়ে করলেন দশ, ১০টি বছর পর। কেন ঐ অপেক্ষা ?

আরেকদিন।
—না, বাধাকপির রস তোমাকে খেতেই হবে।
—আরে, তুমি দেখছি, সব জেনে বসে আছ। নিশ্চয় ঐ চিঠি। তবে শোনো, আমার

এখন কোনো অসুখ নেই।
—সুখও নেই।
— ...
—কি, তাই না ?
— ...
—খাবে, খেতে হবে, না হলে তোমার ঐ মা আনন্দময়ী নিশ্চিন্তে স্বামীর সংসার করতে পারবেন না। বলিহারি বাৎসল্য ! একে বাৎসল্য বলে ?

অন্যদিন।
—তোমার জন্য একটা লেখা উনি দিয়ে গেছেন। এতদিন দি' নি। এতদিন আমি পড়েছি। কেবল তাঁর আশঙ্কা দূর করতে। তিনি সংগ্রহ করেছেন, আমাদের পরিবারের। সবাই কংগ্রেসকে ভোট দেয়। ভোট নিয়ে নাকি তাঁর মাথাব্যাথা নেই। মাথাব্যাথা হল ঐ সমর্থন। ওর মানে আমরা নাকি অ্যান্টি কমিউনিস্ট। যেন তিনি কিছু কম অ্যান্টি কমিউনিস্ট। লিখেছেন, তুমি নাকি কিছু বই পড়তে দিয়েছিলে, যা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে তোমাদের। কিন্তু যে কথা তিনি তখন জানাতে পারেননি সেই কথা লিখে তোমাকে জানাচ্ছেন। এতদিন পর দিচ্ছি। এতদিন তোমার ঐ রাজনীতি আমাকে কিছু বুঝতে হল। এনে দিচ্ছি। এখুনি পড়।

সে চলে যায় লেখা আনতে। কোত্থেকে যে আনতে যায়, জানি না। শুধু টের পাই, ওরও আন্ডারগ্রাউন্ড আছে।

এইখানে কবুল করি, যাঁরা বলেন, বিয়ের আগে পুরুষ যা, বিয়ের পর সেই পুরুষ আর থাকে না, এটা ঠিক না।
এই কথাটা বেমালুম ভুল। অন্তত আমার ক্ষেত্রে ঐ কথাটা খাটেনি।
আমি যা আমি তাই। বিবাহের কিছু আগে, বিবাহের কিছু পরে সন্তান জন্মাবার আগে আমার মধ্যে কিছু অন্যরকম উপাদান দেখা দিলেও, শেষপর্যন্ত আমি যা, আমি তাই থাকি।

ঐ যে ছেলেবেলায় বৃটিশ সিংহ বিল সাহেবের উদ্যত রিভলবারের সামনে পড়ে, 'ক্কি, বাণীনডায় কালেজে ঠাকবে ?' প্রশ্নে আমি, "না, থাকবে না" বলে পালাই—ওর সঙ্গে আমার ৫১ সালের প্রথম নির্বাচনে, ষোড়শবয়সী, আমি যে ২১ হই, তার বিলক্ষণ মিল আছে।
মিল আছে, স্ত্রীর কাছে আমার স্বামী হিসেবে পোটেন্সি হারানো।
মিল আছে, স্ত্রীকে মিহিরের বৌদির দিদি হিসেবে দেখে পোটেন্সি ফিরে পাওয়া।
মিল আছে, রজনীগন্ধাকে ঘৃণা করে তাকে পুনরায় বুকে টেনে নেয়া।

লেখা আসে। আনন্দময়ীর লেখা আসে। লেখা পড়ি :

"এ লেখা যার জন্য, তাকে প্রথমেই জানাই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাওই কেবল পড়লে হবে না। এই সিলেবাস অসম্পূর্ণ। এতে স্ট্যালিন নেই কেন, ভেবে হতবাক হই। মার্কস পড়বার আগে ইমানুয়েল কান্ট পড়া দরকার, তারপর ফিটকে, নীটসে, তারপর হেগেল, বার্গসঁ; ডারউইন-প্যাভলব-পাশাপাশি, অবশ্যই মর্গান, আন্তোনিও গ্রামচি, ট্রটস্কি ও এম. এন. রায়। এ-সব না পড়লে ইনকমপ্লিট হয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী রাজনৈতিক দর্শন। তারপর তো বিজ্ঞান অবশ্যই। এবং ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় রাষ্ট্র-চরিত্র বিশ্লেষণ। তথা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস।

আমি যা বুঝেছি লিখছি, এ দেশে কমিউনিস্টদের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯২১-এ। বলা যায়, ১৯৩৪ পর্যন্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী। ১৯২১-এ, ছাত্রজীবনে রাজনীতি করার জন্য কলেজ থেকে বহিস্কৃত ডাঙ্গে লেখেন 'Gandhi Versus Lenin'। ভাবা যায়, তখন উনি গান্ধীজীর সমালোচনা করেছিলেন আপোসকামী হিসেবে? আর উনিই কিনা পরে বৃটিশদের দালাল হন, স্বয়ং আপোষকামী হন। বলতে গেলে, পার্টি হিসেবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, নয়না সিংএর নেতৃত্বে, বিদেশে, মস্কোতে গঠিত হয়। দেশকে তাঁরা চিনবেন কি করে? এম. এন. রায়ও মেক্সিক্যান কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। পরে কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনাল গঠিত হলে উনি ইনটারন্যাশনালের প্রাচ্য ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত সদস্য হন। অথচ উনি ১৯২৭-এ ইনটারন্যাশনাল থেকে অজানা কারণে বহিস্কৃত হন। তারপর থেকে উনি দলচ্যুত। তিনি অবশ্য কখনো ভারতে পার্টি গড়ার কোনো প্রক্রিয়ায় থাকেননি। দেশে যে কমিউনিস্টদের আত্মপ্রকাশ ঘটে—তার জের টেনে ১৯৩৪-এ প্রকৃত সর্বভারতীয় পার্টি গড়ে ওঠে ফিলিপ (Philip) সাহেবের (এখানেও বিদেশী) প্রচেষ্টায়—সেখানে অবশ্য, ভারতের আদর্শবান যুবকদের আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা, ১৪ বছরের অক্লান্ত প্রয়াসে যে সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে, সেখানের সমস্ত উদ্যোগই ছিল পশ্চাৎগামী গ্রামীণ আবহাওয়ার উপর চাপিয়ে দেয়া বম্বে, লাহোর, কানপুর, কলকাতা শহরের ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের। তাঁরা সবাই ছিলেন পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত মানুষ। নিজের দেশ সম্পর্কে তদনুরূপ ওয়াকিবহাল তাঁরা ছিলেন না। ফলে, বিপ্লব সংগঠনের ক্ষেত্রে তাঁরা ইউরোপীয় পদ্ধতির বিপ্লবকে অনুসরণ করতেন মাত্র, যা ছিল কার্যত সংসদীয়। ফলত তাঁরা বিপ্লব সমাধার ক্ষেত্রে কখনো মোগলের বিরুদ্ধে শিবাজী অথবা বৃটিশের বিরুদ্ধে টিপু সুলতানের সংগ্রামের ধরন বা সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহগুলিকে অনুধাবন করার মানসিকতা পাননি। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন জন্মলগ্নেই নানাকারণে বিদেশী নির্ভর ও দেশ সম্পর্কে উদাসীন। সে পরের জন্য পা বাড়িয়েছে খুব। নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ করার মনোবল তথা মানসিকতা পায়নি। তখন আমাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে গবেষণাও হয়নি তেমন। এরজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হল রাহুল সংকৃত্যায়ন, নীহাররঞ্জন রায়, বিনয় ঘোষ, সর্বোপরি কৃষক বিদ্রোহের অনেকানেক গবেষক ও ঐতিহাসিকদের জন্য। তাঁদেরও কাজ অসম্পূর্ণ।

ফলে আমরা, ভোটের সময় যে গালাগাল খেয়েছি, অর্থাৎ চীনের দালাল, রাশিয়ার দালাল, সেসব আদ্যন্ত সঠিক গালাগাল। কেননা ঐ চীন-রাশিয়া তথা ইউরোপীয় ব্যাখ্যায় আমরা নিজেদের প্রস্তুত করেছি।

আমাদের তেলেঙ্গানা, তেভাগা, কাকদ্বীপে যে বিচ্ছিন্ন বিপ্লব সুরু হয়েছিল, তার শেষরক্ষা হয়নি। উপদলীয় কোন্দলে, সঠিক পথের দিশা না পেয়ে একপ্রকার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল।

প্রধান কারণই ছিল, পার্টি সংগঠনের ত্রুটি। যেখানে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বালাই ছিল না। এবং কমিউনিস্টদের কোনো আচরণবিধিই তেমন ভাবে প্রস্ফুটিত হয়নি। তাই ঠনঠনে কালীবাড়িতে প্রণাম ঠুকে বিভিন্ন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার বহু নিদর্শন আছে। তাই ঘরে ফিউডাল, বাইরে প্রোলেতারিয়েত হওয়ার চেষ্টায় বিপ্লব বারবার ঘরের খাটের তলায় লুকিয়েছে। জীবনে আনতে হবে ঐ কাঙ্ক্ষিত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগকর্ম। নতুবা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে আমরা কেন ভোটযুদ্ধে কেবল কমিউনিস্ট এনার্জি হারাবো ?

যাদের সংসার ধর্ম কেবল স্ত্রীকে শয্যাসঙ্গী করা অথবা হেঁসেলে রাখা, স্ত্রীকে সহযোদ্ধা না করা, তাদের কপালে দুঃখ অনেক। তাদের ডিপ্রেশন স্বাভাবিক। এখন ঘর থেকেই সুরু করতে হবে বিপ্লব।

ঘর থেকে সুরু করতে হবে বিপ্লব।

হায়, যখন বিবাহ করলাম, কেউ এসে জানতে চাইল না, স্ত্রী কি কমরেড ?

বরং বিদুষী সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে চুটিয়ে সংসার করতে গিয়ে দেখলাম, কোনোটাই হল না। না হল সংসার করা, না হল বিপ্লব।

১৯৬২।

তখন স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য কলহ তুঙ্গে।

ঐ বছর শরতে, স্ত্রীর জন্মদিনে, সীমানা সংক্রান্ত কলহ হল খুব। শেষ অব্দি হিংসাত্মক কলহের সুরু। হল কী, স্ত্রী ইলিশ ভালোবাসে বলে বাজার থেকে ইলিশ কিনে আনি ভরদুপুরে। তখন আসানসোলে সারাদিন খোলা থাকত মাছের বাজার। অন্তত বিশ্রামরত চটের ঢাকনা খোলাতে পারতাম আমি। স্ত্রী তখন নিদ্রিত। নিঃশব্দে রান্না করি। ঐ সেই কুমড়ো পাতা মোড়া সর্ষের ইলিশ ভাতে। স্ত্রী জেগে উঠবার আগেই আমার সব কাজ সারা হয়ে যায়। তাকে দেখি শয্যায় অকাতর। সন্ধ্যা হয় হয়। আমি রেকর্ড-প্লেয়ার চালাই। লো ভলিউমে।

কি কুক্ষণে যে 'তবু মনে রেখ' 78 আর. পি. এম.এ প্লে করি, আর ঐ রবীন্দ্রকণ্ঠে, যা বুক খেয়ে নেয়, বাঁচতে দেয় না, আবার মরতেও দেয় না, জানি না কেন আমার ঐ ভীমরতি হয়, ঐ 'তবু মনে রেখ' তে, জানি না।

'তবু মনে রেখ'তে সে অবশ্য জাগে না। জাগে 'যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে…'তে।

জেগে, কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকায়।
—বন্ধ করো, বন্ধ করো ঐ গান।
বন্ধ করি না। শুনি, "থাক আর সোহাগ করে ঐ গান বাজাতে হবে না,—জানি তো তোমার 'পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে…' —তো ঐ নতুন নাগরী কে ?"
পৃথিবীর সব 'কে'-র উত্তর হয়। ঈশ্বর 'কে' ? উত্তর হয় না। আমি কে ? উত্তরই হয় না। তুমি 'কে' ? তার উত্তর অব্দি হয় না।
—কি জবাব দিচ্ছ না যে ?
—কি জবাব দেব।
—নতুন আনন্দময়ী কে ?
—স্টপ।
—স্টপ মানে ?
—থামো, আর চোপা বাজিও না।
—ও, আমি কথা বল্লেই বুঝি চোপা বাজানো হয় ?…চোপা ! যতসব গ্রাম্য কথা ! আর তুমি যে চোপা বাজিয়েই চলেছ রাসটিক !
—কোথায় চোপা বাজাচ্ছি ?
—বাজাচ্ছ না, ঐ যদি পুরাতন প্রেম… ? জানি তো আমি ওল্ড, তোমার কাছে ওল্ড ফসিল।
—জানো, কে গাইছেন ?
— …
রাগে ফুঁসতে থাকে; কথা বলে না।
প্লেয়ার বন্ধ করি।
বাইরের ঘরে যাই। লিভিং রুমে।
সে আসে।
—ওঃ, গোসা ঘরে এলেন ! কেন শোবার ঘরে থাকতে কি হয়েছিল ? কি হয়েছিল, বদমাশ ?
—ফের ?
—ফের কি ?
—ফের বদমাশ ?
—বলবই তো বদমাশ। মদখেকো ! যত্র-তত্র মধু খেয়ে বেড়ানো ! আনন্দময়ীর বয় ! মিথ্যেবাদী। কমিউনিস্ট হয়ে চর্ব-চোষ্য খায়, দুশ্চরিত্র হয় ! কমিউনিস্ট হয়ে বেশ্যাবাড়ি যায় ! লজ্জা করে না।
—বাড়ির থেকে কি বেরিয়ে যাব ?
—তাই যাও ? যাও, নবপ্রেমজালে বদমাইশি করো গিয়ে। আমার সীমানায় এসেছ কি, লোক ডাকব। লোক ডেকে বলব তোমার কীর্তি কাহিনী ! আবার কমিউনিস্ট !

আমি উঠে পড়ি। পা-জামা পরাই ছিল। কেবল পাঞ্জাবী পরা। বেরিয়ে পড়ি।
—বেরুচ্ছ, বেরোও! আর ঢুকেছ কি পুলিশ ডাকব।...দাঁড়াও, বেরুলে জন্মের মত বের হও। আমার একটা হিল্লে করে বের হও। নিজের গোপন জিনিসপত্র সব নিয়ে যাও। মদের বোতল নিয়ে যাও, লুকানো টাকা নিয়ে যাও, আনন্দময়ীর সব স্মৃতি নিয়ে যাও। বলে সে দরজা আটকায়। আমি বেরুতে পারি না। মুখ গনগনে।

ঐ মুখ আমি চিনি। ঐ মুখ সাজতে ভালোবাসে। ঐ মুখে সুস্নাত সুবাস। ঐ মুখে কেবল হাতে হাত। সব কাজ তুচ্ছ মনে হয়। সব স্বপ্ন পণ্ড মনে হয়। সব ক্রোধ সামান্য মনে হয়। সব কিছু শূন্য মনে হয়। শূন্য মনে হয়। আবার পূর্ণ মনে হয়, পূর্ণ মনে হয়।

ঐ মুখ চুম্বন করে। ঐ মুখে জিভ আছে। আস্বাদন করে আমার জিভ। ঐ মুখের উপর যে মনন, মেধা, মেমারি, সেই মাথায় যে মস্তিষ্ক, ব্রেন, রিয়ালাইজেশন, সেই মাথায় দেখি সব ত্রিনয়ন, সব দেখতে পায়। কিছুই লুকানো যায় না। কিছুই লুকানো যায় না। মদের বোতল না, গোপন টাকা না, গোপন অভীপ্সা অব্দি না।

সারারাত তর্ক হয় কে কার সীমানা, কে কখন লঙ্ঘন করেছে।

পড়ে থাকে ভাত। পড়ে থাকে ভাতে ভাত। ইলিশ ভাতে।

আমরা উভয়ে উভয়ের সীমানা লঙ্ঘন করি।

সে স্কুলে কাজ নেয়। মিশনারী স্কুলে। দুদিনে খৃস্টান হয়। সেই যীশুর শিষ্যা হয়, যিনি সপ্তাহে একদিন ছুটির ব্যবস্থা করেছিলেন ক্রীতদাসদের, মজুরদের, কথা ভেবে। রবিবার।

যিনি এখন নিজের সীমানা লঙ্ঘন করে মিশনারী হয়েছেন।

সীমানা লঙ্ঘন অন্যত্রও হয়।

ঠিক ঐ সময় ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীনের সঙ্গে ভারতের পঞ্চশীল সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটতে থাকে। হঠাৎ শ্রীলঙ্কায় যাবার আগে নেহরু, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে হুকুম দিলেন, "আক্রমণকারীদের (চীনেদের) হটিয়ে দাও। তারা সীমানা লঙ্ঘন করেছে।"

ঐ নেহরুরই একান্ত বিশ্বস্ত, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর তৎকালীন অধিনায়ক তাঁর "আনটোল্ড স্টোরী"তে লিখেছিলেন, পরে, "চীনের এলাকায় হামলা করতে যে সামরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন আমাদের তা নেই। তা সত্ত্বেও নেহরুর এই আদেশ ভারতীয় বাহিনীকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফেলেছিল।"

এতে কি স্পষ্ট নয়, হামলা কে সুরু করেছিল ?

যাই হোক, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই চীনা গণফৌজের পাল্টা আক্রমণে সাড়ে তিন হাজার ভারতীয় ফৌজ, তাদের অফিসার সমেত, আসামের বমডিলায় প্রায় বিনা যুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করল। সঙ্গে সঙ্গেই চীন গণফৌজ ফিরে গেল। তথাকথিত সীমানা

ম্যাকমোহন লাইনের ১২২ কিলোমিটার উত্তরে সরে গিয়ে একতরফা ভাবেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল।

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, "এক বিজয়ী বাহিনীর নিজে থেকেই পিছু হটে যুদ্ধের অবসান ঘোষণা পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি।

স্ত্রীর সব রাগটাই গিয়ে পড়ল আমার উপর।

—ঐ তো কমিউনিস্ট! শ্বেত কপোত আঁকা। লজ্জা করে না, জানোয়ারের মত মানুষের আত্মা ও অস্তিত্বের উপর গোলাবারুদ রেখে যুদ্ধ করছে চীন? এমন হিংস্র ভাবে তোমাদের মুখোমুখি দাঁড়াবো, শয়তান, চীনের দালাল, এমন হিংস্র ভাবে দাঁড়াবো, যেরকম ভাবে মানুষ কখনো পৃথিবীতে দাঁড়ায়নি।

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে এগিয়ে এসে আমার বুকে কিল মেরে ক্রোধে অন্ধ হয়ে বল্ল, তোমাদের প্রতি তোমাদের নারীদেরও ভালোবাসা নেই কামনা করব। আমরা ভালোবাসতে পারব না তোমাদের মাতৃভূমি চীনের কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখ।

সে ভুলে গেল, সে আমার স্ত্রী। সে ভুলে গেল, সে ভারতীয়। সে ভুলে গেল, আমি ভারতীয়। সে ভুলে গেল, সার্থক জনম আমার। ভুলে গেল, সকল দেশের রাণী। ভুলে গেল জননী জন্মভূমি। ভুলে গেল, তার সন্তান নেই, হবে না আর কখনো।

কে যেন বলেছিলেন, রাসেল সাহেব কি? বলেছিলেন, ঘরের মধ্যে যে ফ্যামিলি, অধুনা হাউজহোল্ড, ফ্যাসিবাদ সেইখানেই থাবা লুকিয়ে রাখে। কেননা ফ্যামিলি অথবা হাউজহোল্ড, যদি সে কখনো Self-Control হারায়, তাহলে ঐ থাবা উদ্যত হয়।

"But Self-Control will be applied more to abstaining from interference with the freedom of others than to restraining one's own freedom."

"Everything Surreptitious is undesirable, and sex relations which are serious cannot develop their best possibilities without children and a common life. Moreover, if a man or woman is young and vigorous, it is not in the public interest to say: '*You shall have no more Children*'. Still less is it to the public interest to say what the law does in fact, say, namely, '*You shall have no more children unless you choose a lunatic for their other parent*.'"

—তবু টেস্টটিউব ভালো। পেটে ধরা? তোমাদের তো ধরতে হয় না।

ডাক্তার জানিয়েছিলেন, অত্যধিক ওরাল কনট্রাসেপটিভে সেকেন্ডারি স্টেরিলাইজেশন হয়।

"The family is decaying fast, and internationalism is growing slowly.

The situation, therefore, is one which justifies grave apprehensions. Nevertheless, it is not hopeless, since internationalism may grow more quickly in the future than it has done in the past, Fortunately, perhaps, we cannot foretell the future and we have therefore the right to hope, if not to expect, that it may be an improvement upon the present."

এই আন্তর্জাতিক হবার পথেও কোনো কোনো পৃথিবী বড় বাড়াবাড়ি করে।
হরেকৃষ্ণ কোনার অবশ্য বাড়াবাড়ি করেন না।
ঐ ৬২-তে পরাজিত ভারত সরকারের সব রাগটাই গিয়ে পড়ল কমিউনিস্টদের উপর। ভারতরক্ষা (?) আইনে ব্যাপক গ্রেপ্তার সুরু হল। সব এম. পি., এম. এল. এ., পার্টি'র রাজ্য কমিটির সদস্য, জেলা কমিটির সদস্য, এমনকি এলাকার ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বাররাও অ্যারেস্ট হল। চারু মজুমদারকে ২১ নভেম্বর অ্যারেস্ট করে প্রথমে জলপাইগুড়ি, পরে দমদম সেন্ট্রাল জেলে রাখা হল।
ঐ জেলে হরেকৃষ্ণ কোনারও ছিলেন।
উনি জেলে দুটো ক্লাশ নিলেন। জার্মানী, বৃটেন ও আমেরিকার বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রকে কিভাবে উচ্ছেদ করেছিল তার উপরে।
চার নম্বর ওয়ার্ডে ক্লাশ হওয়ায় সকলেই উপস্থিত থেকে নীরবে শুনতেন।
কানু সান্যাল জিজ্ঞাসা করলেন, "সামন্ততন্ত্রকে খর্ব করেও যেখানে জিইয়ে রাখা হচ্ছে সেখানে কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠবে কি করে ?"
—সামন্ততন্ত্রকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার সংগ্রামই সেখানে প্রধান হবে। হরেকৃষ্ণ কোনারের এই উত্তরে চারু মজুমদার বলেছিলেন, "কৃষকের সংগ্রামলব্ধ অধিকার ও জমির উপর অধিকার রক্ষার জন্য কৃষকেরই হাতে অস্ত্র দেওয়ার বিষয়ে আপনারা কি ভাবেন ?"
জবাব নেই।

ঐ হরেকৃষ্ণ কোনার, ভিয়েৎনাম ফেরতা, আমার নাম তোমার নাম ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনাম, কয়েক বছর পরে, গদিতে বসে, হুঙ্কার দিয়েছিলেন, কী, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান ?
মুছে দাও ঐ দেয়াল-লিখন। পিঠের চামড়া খুলে নাও ঐ সব অতিবামদের। ওরা আসলে সিয়ার দালাল।

তার কয়েকমাস আগে চারু মজুমদার বল্লেন, আমি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি'র পার্টি মেম্বার মনে করি নিজেকে।

নাও, এবার আন্তর্জাতিকতা সামলাও।

হায়, কতদিন আগে জীবনানন্দ বলে গেছেন,

তৃতীয় চতুর্থ সব আন্তর্জাতিক ভেঙে গড়ে ভেঙে গড়ে,
দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব আসিতেছে ঐ।

—কি, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান বলতে লজ্জা করে না? তোমাদের কমিউনিস্টদের কি বাপের ঠিক আছে! তোমাদের কমিউনিস্টদের বাপ-মার বিয়ে হয়েছিল তো?

তখন নকশাল বাড়ির দাবানল। বসন্তে বজ্রের নির্ঘোষ।
হাতে পাই খাপ সমেত এক ভোজালি। যায় খাপটাও মেটালের। অগ্রভাগও চোখা।
ঐ খাপ সমেত, ক্রোধে অন্ধ হয়ে, স্ত্রীর পিঠে বসাই। খাপ খুলতে পর্যন্ত জানি না।
স্ত্রী তাতেই ক‍ঁকিয়ে অজ্ঞান হয়।
আহা কান্না কেন আসে? এ হেন শ্রেণীসংগ্রামে কান্না কেন আসে?

চারু মজুমদার আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, আপনাদের মতো পুঁথিপড়া প্রোফেসাররা আসলে পেপে চোর। হ্যাঁ, এখন হয়ত ট্রিগার চিনি না, ভোজালি থেকে খাপ খুলতে পারি না। ঐ খাপই বসাই শ্রেণীশত্রুর পিঠে। দেখেছি, তাতেই অজ্ঞান হয় সি. পি. এম.— So what?
শুনুন, প্রোফেসার, বিপ্লবের বন্ধ্যা যুগে বিপ্লব কবে সুরু হবে, এখন না, বহু পরে (অর্থাৎ কার্যত কোনো কালেই না), এই তর্কের মধ্যে নকশালবাড়ি হাজির হয়েছিল একটা বক্তব্য নিয়ে।
শুনুন, প্রোফেসার, গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরুন, স্কুল-কলেজ ছেড়ে কৃষিবিপ্লবের পথ ধরুন, শ্রেণীশত্রু খতম করুন, অস্ত্র কাড়ুন, অস্ত্রের ব্যবহার শিখুন, অস্ত্রই রাজনৈতিক শক্তির উৎস।
স্ত্রী রাঁধছিল উত্তপ্ত কড়াই-এ মাছ। ভাজা হচ্ছিল। ভাজা মাছও উল্টে খেতে জানত না বলে, বলে বসল, "নিন, স্নান করুন, কোন ফকস হোলে দুঘণ্টা কাটিয়ে এলেন কে জানে, এবার চর্বচোষ্য গিলুন, কমিউনিজম করুন ঘরের খেয়ে দেয়ে, যান তারপর, বনের মোষ তাড়াতে যান। আমিও কি বনের মোষ?''
এর জবাব দি' ওর হাত মুচড়ে। সেও কম যায় না, ঐ উত্তপ্ত খুন্তি আমার গালে মারে। গালে খুন্তিপ্রতিম ফোসকা পড়ে।

কোথায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় স্বামী-স্ত্রী কমরেড হবে পরস্পরের—তা না হয়ে হলাম পরস্পরের শ্রেণীশত্রু।

—ভাটনগর কোথায়, নেপালে? ওখানে কোন নাগরী থাকে তোমার? এ-সব অলক্ষুণে কাগজপত্র পাঠায় কোন নবপ্রেম? চণ্ডালে ডাকিয়া আনি পোড়াও পুস্তক।

নিজেই চণ্ডাল হয়। পোড়ায় মাও এর 'অন কনট্রাডিকশন', পোড়ায় 'মাও'জ ডকুমেন্ট অন আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার' পোড়ায় রেডবুক। পুড়তে থাকে আমার আন্তর্জাতিকতা। পুড়তে থাকে চেয়ারম্যান মাও-এর ছবি।

পুড়ুক, তোমাদের চেয়ারম্যান মাও-এর ছবি পুড়ুক। তিন তিনটে বিয়ে। শেষেরটা আবার অ্যাকট্রেস। মোঙ্গোলয়েড ক্ষুদে বুকের সাইজ বাড়াতে বিদেশ থেকে ব্রেসিয়ার এনে পরে, লজ্জা করে না? কৈ, তোমাদের চেয়ারম্যান মাও তো ঐখানে কালচারাল রেভোলিউশন করেন না?

এ-সবেরও জবাব হয় না। এতে কিছুই প্রমাণ হয় না।

পংকজ এল। একটা দলিল দিয়ে গেল। মধ্যপন্থাকে চূর্ণ কর, ধ্বংস কর। বলে গেল, রোজ দুপুরে একজন কমরেড আসবে খেতে। ১১টায় আসবে। আপনার স্ত্রী স্কুলে চলে গেলে। একই ছেলে আসবে তা কিন্তু নয়। একেক দিন একেকজন হয়ত। তবে প্রতিদিন একজন। এসে বলবে, আপনার কাছে চিনি হবে? শনি-রবিবার আসবে না। আপনার স্ত্রী বাড়ি থাকেন। ঐ দুই দিন আপনি দশটাকা করে মোট কুড়ি টাকা দেবেন শুক্রবার, ফ্রাইডে, যে আসবে, তাকে।

প্রতিদিন আসে। প্রতিদিন খাওয়াই। নিজের বরাদ্দ থেকে। বরাদ্দের মাছও খাওয়াই। ভাতও কম পড়ে। ডাল কম পড়ে না। প্লেট ধুয়ে নিয়ে, কখনো সেই পাত্রে যা আমার বাকি বরাদ্দ, খাই। ভালো লাগে। এও আমার এক আন্ডার-গ্রাউন্ড।

বুগাদার এমন এক আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল। রোজ দুপুরে প্রাইমারী স্কুল থেকে বেলা ঠিক দেড়টায় ফিরে, যে যুবতী ভিকিরি ওদের নিচতলার পোড়ো বারান্দায় শুতো, তাকে ডেকে নিয়ে, রান্নাঘরে, খাওয়াতেন নিজের বরাদ্দ থেকে ডাল-ভাত-মাছ। বুগাদার মা তখন ঘুমিয়ে। বাবা বেঁচে নেই। ভাই বোন স্কুলে। সেই শাকচুন্নি ভিকিরি একদিন প্রকৃত যুবতী হয়। এবং আরেক আন্ডারগ্রাউন্ডে, ভরদুপুরে, নীচতলার ঘরের পরিত্যক্ত আসবাবের ভাঁড়ারে, এক খাট ছিল আদ্দিকালের, তার ধুলি ধুসরিত গদির উপর নিজে শুয়ে শোয়াতেন ঐ শাকচুন্নিকে, বলা বাহুল্য তখন সে তাঁরই খেয়ে পরে যুবতী বিশেষ।

পংকজের ঐ ব্যবস্থার পরবর্তী বিজয়া দশমীর দিন আসানসোল ডি. আই. বি. অফিস থেকে একজন অফিসার আসেন গাড়ি নিয়ে। আমাকে বিজয়ার উৎসবে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান।

—এভাবেই আপনাকে ডাকলাম। নিন আগে মিষ্টিমুখ করুন।

করি।

—সিরাজকে চেনেন তো? সে মারা গেছে। তার ডাইরীতে, বীরভূমের জঙ্গলে উদ্ধার করেছি আমরা ঐ ডাইরী, ওতে আপনার নাম আছে। ডঃ হাজরার কাছ থেকে

স্যাম্পল ফাইল নিয়ে আপনি যে পাচার করেন বীরভূমের জঙ্গলে, তার কয়েকটি ডেট আছে।
—আমি সিরাজকে চিনি না।
—নিজের প্রিয় ছাত্রকে চেনেন না ? তাই হয় ? দুপুরে ভাত খাইয়েছেন আপনার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে, আমাদের হিসেব, মোট ৯ দিন। অস্বীকার করবেন ?...কি, জবাব দিচ্ছেন না যে ?
—জবাব আবার কি দেব ? আমি তখন কলেজে থাকি।
—কলেজে থাকেন ? আমাদের হিসেব, আপনি এই বছর এ যাবৎ মোট ৪৫ দিন কলেজে গেছেন। তাও বেলা দুটোর পর। ফিরেছেন এক ঘণ্টার মধ্যে। আমরা কিন্তু এভাবে ইন্টারোগেট করি না। আমরা শক দি'। আঙুলের নোখে আলপিন ফোটাই। লাইটার জেবলে আঙুল পোড়াই। পেনিসে ইলেকট্রিক শক দি। অণ্ডকোষ টিপে ধরি শক্ত মুঠিতে। কচলাই। কেবল কচলাই।
সামনে সদা হাস্যময়ী প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার ছবি। আর ঐ ভাবলেশহীন পোকার ফেস ডি. আই. বি-র। 'র', রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল ব্যুরোর এজেন্ট। ইন্দিরা প্রতিষ্ঠিত 'র'-এর।

অব্যাহতি পাই সেদিন পরের দিন মুচলেকা দেব এই অঙ্গীকারে।
কলেজের সি. পি. আই. সহকর্মীকে ধরি। তিনি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন জানতে পারিনি আজও। কেবল, আমি আর দুপুরে কাউকে খাওয়াবো না, মহাদেব মুখার্জির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না। আর ড. হাজরার চেম্বারে গিয়ে স্ত্রীর অবস্থা জানাবার অছিলায় ওর চেম্বারের পাশে অ্যান্টিরুমে ঢুকে লিস্ট অনুযায়ী স্যাম্পেল ওষুধ নেব না কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ ভরে। এতেই অব্যাহতি পাই।

পুরো অব্যাহতি পাই না। প্রায় শ' দুয়েক লোক একদিন আমার বাড়ি চড়াও হয়। এক স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীলোক আমাদের পাড়ায় থাকেন, তাঁকে জড়িয়ে আমার চরিত্রহনন হয়। এবং আমি মার খাই। সেই সমাবেশে আমার প্রাক্তন কমরেডদেরই বেশি দেখি, আনাচে কানাচে। বলা বাহুল্য, পাড়ার সেরা লুম্পেন আমার গালে চড় মারে।

ঐ লুম্পেনকেই দেখি লেফট ফ্রন্টের ভলান্টিয়ার হয়েছে ১৯৭২-এ। আমি ভোট বয়কট করি।

ঐ সময়ের ২।১ বছরের মধ্যে, আগে-পরে, দু'জায়গায় পালাই। এক বরাহনগর, আগেই লিখেছি। দ্বিতীয় কুচবিহারে, সেকথাও লিখেছি।
কুচবিহারে যাবার সময় বীরভূম হয়ে যাই। আশিস সঙ্গে যায়। দেখি, ফকস-হোল। কর্তিত শালগাছে ঢাকা। তলায় যাই। তিনবার উলুধ্বনি দিতে শুনি আশিসকে। একজন পাইপগান নিয়ে বাইরে আসে। আমাকে অবলোকন করে। তারপর আমাদের নিয়ে যায় ভিতরে। দেখি এক ছিমছাম ও. টি.। সব আছে। পরিচ্ছন্ন

ধবধবে শাদা বেড। বেডের উপরে ঝোলানো ডে-লাইট, হ্যাজাক। স্পষ্ট মনে হল ভুল হতে পারে, নীচু মুখ চারু মজুমদার টিনের চেয়ারে ঝিম বসে। কে একজন তাঁর বাহুতে ইনটার-মাসকুলার ইনজেকশন দিচ্ছেন, পেথিড্রিন, জানি। নিমেষে তিনি চাঙ্গা হন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসেন, কি প্রোফেসার, মুচলেকা দিলেন। ভয়ে আমি হিম হয়ে যাই। মনে পড়ে, তিনি একদা বলেছিলেন, "বৃষ্টির জল মাটির তলায় চলে গিয়ে ক্রমে ক্রমে প্রবল দাহ্য পেট্রোলে পরিণত হয়। তোমরাও জীবন যুদ্ধে পোড় খাওয়া মানুষের মতো ঐ অবিশ্রান্ত জনবৃষ্টির জল খেয়ে খেয়ে, তাদের গায়ের রক্ত জল করা জল খেয়ে খেয়ে, তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ঘাম খেয়ে খেয়ে ঐ পেট্রোল হয়ে যাও। শুধু আগুন, দাবানল ছোঁয়াবার ওয়াস্তা।"

তাঁরই ছোটো ছেলে, সৌরেন বসু, তাঁরই ডান হাত, বলেছেন, তারই ছোটো ছেলে, ছোট্ট অভি ছিল দারুণ। বাড়িতে, সকালে, ঐ কথার পর, উঠোনে একটা কাঠি পুঁততে পুঁততে অভি বলে—বাবা, এখানটায় খুঁড়লে পেট্রোল বেরোবে ? এখানেও তো বৃষ্টির জল খুব পড়ে ! সংশোধন করেন না চারু মজুমদার। নিজেও বিশ্বাস করেন তাই।

অথচ পেট্রল তো. : 'A hydro carbon (C_8H_{10}) occuring in petroleum' : এবং পেট্রোলিয়াম হল বস্তুত rock oil। পৃথিবী কোন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অরণ্য অধ্যুষিত সপ্রাণী অরণ্যানীকে rock area-য় কবর দিয়েছিল একদা।

এবং জানুন, আপনার ঐ বৃষ্টি ইমেজ পেট্রলের ক্ষেত্রে অন্তত অসঙ্গতিপূর্ণ এবং বিজ্ঞানমনস্ক না হলে পৃথিবীকে বদলানো যায় না।

অজ্ঞানতার কাছে মুচলেকা তো আপনিও দিলেন।

আর আমি তো খর্বকায় উন্মাদ বিশেষ। মনে রাখবেন, মার বুকের কুইনাইন খেয়ে সচেতন হয়েছি। আমি মুচলেকা দেবো না তো কে দেবে ?

পংকজ আমাকে শেখায়, "কমিউনিস্টদের প্রতিটি বিষয়ে 'কেন' বলে প্রশ্ন করা উচিত এবং নিজের মাথা খাটিয়ে ভাবা উচিত বিষয়টা যুক্তিসঙ্গত কিনা, বাস্তবের সাথে মিলছে কিনা। কোন বিষয়েই কমিউনিস্টদের দাসত্ববাদকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত না।"

এও সে জানায়, "রাশিয়া এবং চীনের রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত ভারতের মার্কসবাদীরা ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা ভারতের বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব এবং বিকাশের পর্যায়গুলি অনুধাবন না করে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের ভিত্তিতে কেবল স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু পরাধীন ভারতের ঔপনিবেশিক চরিত্রটি স্বাধীনতার পরে কেবল ঔপনিবেশিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই ঔপনিবেশিক ধরনের চরিত্রকে কিছুতেই শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। ভারতের অবিকশিত

উপজাতি এবং জাতিসত্তাগুলির উপর ইংলন্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বণিক সাম্রাজ্যবাদীরা একটি কেন্দ্রীভূত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলে ভারতের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন উপজাতি এবং জাতিসত্তাগুলিকে একটি দেশের রাষ্ট্রীয় সীমায় আবদ্ধ করতে সুরু করেছিল। তার পূর্বে দেশ হিসাবে ভারতবর্ষের কোনো রাষ্ট্রীয় সীমা ছিল না। বিভিন্ন উপজাতি এবং জাতিসত্তায় বিভক্ত ভারতবাসীর উপরে বিজাতীয় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থাপিত হবার ফলে উপজাতিগুলিকে আত্মীকরণ করে জাতিসত্তাগুলির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হল এবং জাতিসত্তাগুলির ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয় রাষ্ট্র বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে রইল। এইভাবে স্বাধীনতার পূর্বেই পরাধীন ভারতের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর মন্ত্রীসভা স্থাপন করে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার ফলে তার ঔপনিবেশিক চরিত্রের কোনো মৌলিক পরিবর্তন হল না। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বেই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার ঔপনিবেশিক ধরনের চরিত্রটি নির্ধারিত হয়ে গেল। পরবর্তী ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন এবং সেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে পরাধীন ভারতবর্ষের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক দেশের সৃষ্টি করা হয়।

বিভক্ত ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং দাস সংবিধানকে ভিত্তি করে রচিত স্বাধীন ভারতের সংবিধান ১৯৫০, ২৬ জানুয়ারি, ইংরেজদের হাত থেকে পাওয়া ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র হল ঔপনিবেশিক ধরনের। এটাই হল ভারতের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডির দ্বারা বিভ্রান্ত নকশাল-পন্থীরা বিদেশী রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাবে স্বাধীন ভারতকে আধা ঔপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ ধরে নিয়ে এবং নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়ে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের ভুল রাজনৈতিক লাইনের শিকারে পরিণত হল।

সি. পি. এম.ও শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের সাহায্যে স্বাধীন ভারতের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক ধরনের রাজনৈতিক চরিত্রকে বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে জমিদার বুর্জোয়া চরিত্রের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতন্ত্র অর্থাৎ জনগণের গণতন্ত্রের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক লক্ষ্যস্থির করেছে।

বর্তমানে তথাকথিত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সি. পি. আই. (এম) রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবী নিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করেছে।

ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রকৃত কাজ হবে সঠিক তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার জন্য সকলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রকে বিকশিত করা। কোনো মতেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে গণতান্ত্রিকতাকে সংকুচিত এবং খর্ব করা নয়।''

এরকম পংকজেরা আসে যায়। অর্জুনেরাও আসে যায়।

উপরন্তু অর্জুন বলে বসে, পরিবার থেকেই সুরু হোক বিকল্প অর্থনৈতিক কাঠামো—

যে কাঠামোতে এক একটি হাউজহোল্ড এক একটি ফার্ম বিশেষ—এভাবে দেশের ফার্মগুলি ঐ সর্বাপেক্ষা ছোট্ট ইউনিটের হাউজহোল্ড ফার্মের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর দ্বারা পরিবর্তিত হোক যৌথ ও কমিউনিটি প্রোডাকশনে।*

বীরভূমের সেই ফকসহোলে ঐসব কথাগুলি ঢোকে না। বরং সেইসব শেয়ালেরা চেয়ে দেখে বরফের রাশি জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে।
—কিন্তু আপনাকে তো ছাড়া-গোরুর মত ছাড়তে পারি না। আপনি এখন বিপদজনক। মুচলেকা এযাবৎ কারা কারা দিয়েছেন, জানেন? এক ডাঙ্গে সাহেব, দুই অজয়বাবু, তিন বসু, অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট আপনি। এবার ভাবুন, কেমন বিপদে পড়লেন আপনি। একদিকে সি. পি. এম. আপনাকে ঠেঙাবে। অন্যদিকে আমরা, কিছু বিচ্যুতি দেখলেই ঠেঙাবো। না, ঠেঙাবো না। আপনাকে আসলে আগাপাস্তালা অস্ত্রহীন করব। আপনার ডানহাত ভেঙে দেব। আর যদি আপনি মুচলেকা দিয়েও জনগণের পক্ষে থাকেন, যেমন আছেন এক কাকা; দুই, পরিমল, তিন বিপ্লব, লাস্টলি উৎপল, তাহলে আপনাকে রক্ষা করব।

বীরভূমের ঐ ফকসহোল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি কোচবিহারের দিকে পা বাড়াই। আশিস আমাকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বাসে নিয়ে গিয়ে তুলে দেয় ট্রেনে।

আমার স্বপ্ন অপরিসীম। আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই। দিন বদলের স্বপ্নপালা আমি এখনো দেখি। পালটে দেবার স্বপ্ন আমার এখনো গেল না।

দেখি, কৃষ্ণনগরের কুমোর পাড়ায় অজস্র নেহরু, জহরকোট পরা, দেখি ইন্দিরা, রাজীব প্রমুখ স্ট্যাচুর স্টুডিওতে বিশাল এক লেনিনের মূর্তি। তার খোলে আন্ডারগ্রাউন্ড।

দেখি, চিত্রমন্দির সিনেমা হলের পর্দার পিছনে মা কালী। মা কালীর মতই নরমুণ্ড-মালা গলায় পরে, আসলে আমার মা আনন্দময়ী, মা কালীর মতই ঐ ছিন্নহস্তের শতনলি হার পরে, তিনি, আনন্দময়ী, আমাকে ডাকছেন, "আয়, অসুর নিধন করবি, আয়!"
তাঁর ডাকে সাড়া দি'। কাছে যাই। মা কালীর উদ্যত বক্ষ যেন অগ্নি, পাবক, যেন অগ্নি জ্বলে। আমি পুড়তে থাকি।

শেষ কথা এই, আমার ডানহাত ওঁরা ভেঙে দেবে বলেছেন, তারই অপেক্ষায় আছি। সর্বক্ষণ কেবলি হাতুড়ির শব্দ পাই, যেন আমি মেক্সিকোতে, লা ভিভা মেক্সিকোতে। আমার মাথার পিছন অবিকল ট্রটস্কি যেন। হাতুড়ি উদ্যত। তবু গাই, পরাজয় সহে না অন্তরে তোমার, তুমি যে জয়ের মূর্তি, কমরেড স্তালিন।
অন্ধের জনযুদ্ধের গান ভেসে আসে।

---

* এই ডাইরীতে আলাদা পৃষ্ঠায় অর্জুন সেনের পেপার আছে। যা হুবহু এই: পৃষ্ঠা ৫১ দ্রষ্টব্য।
—উদয়ন ঘোষ।

হয়তবা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিম কথা। হয়তবা রক্তের পিপাসাই ঠিক। স্বাভাবিক। মানুষও রক্তাক্ত হতে চায়। হয়তবা বিপ্লবের মানে শুধু পরিচিত অন্ধ সমাজের নিজেকে নবীন বলে অগ্রগামী (অন্ধ ?) উত্তেজের ব্যাপ্তি বলে প্রচারিত করার ভিতর। হয়তবা শুভ পৃথিবীর কয়েকটি ভালোভাবে লালিত জাতির কয়েকটি মানুষের ভালো থাকা, সুখে থাকা, রিরংসা রক্তিম হয়ে থাকা। হয়তবা বিজ্ঞানের অগ্রসর, অগ্রগতির মানে এই, শুধু এই। হয়তবা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয়। হয়তবা মৃত্যু নেই। প্রেম আছে। শান্তি আছে। মানুষের অগ্রসর আছে।

সেই সি. পি. আই. সহকর্মী আমাকে জানালেন, সবচেয়ে লুম্বিনীপার্ক ভালো। নিরাপদ। আপনাকে সেখানেই পাঠানো হবে॥

উদয়ন ঘোষের সংযোজন

সেখানে সে ভালোই থাকে। আমি একবার যাই সেখানে। দেখি, এক মুখ দাঁড়ি নিয়ে সে বিছানায় বসে। সামনে দাবার বোর্ড। আনমনে খেলছে। প্রতিপক্ষ অদৃশ্য।

—দেখছেন তো আমি কেমন মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলছি। এমন এক চাল দিয়েছি এই লুম্বিনী পার্কে ঢুকেই, আজও মৃত্যু তার নিজের চাল দিতে পারছেন না, যে চালই দিন তিনি এবার কিস্তিমাৎ।

আমি একটা ইংরাজি কবিতা লিখেছি, শুনবেন ?…

Let 0 be a point
And listen that point covers no area as such
And has no length nor breadth, not even height.
That is, point is nothing and nothing and somehow zero,
But remember, point is not a zero at all.
And zero has no point over all.

Zero is zero.
Not only that, zero is also a number on the whole.
And any number will never be zero any time.
However, all zeroes are seemingly not equal.
Like, zeroes, all men are not equal.
And all women also are not equal.
Like men & women, all children are not equal in the world around.
Like children, all equals do not appear to be equal.
And only all equals and unequals are equal in the underground.

কি, ইংরাজির 'ক'-অক্ষর যার গোমাংস, সে পারলো তো !

আরেকটা শুনুন ! এটা অবশ্য স্রেফ বাংলা :

দূরত্বের অর্থ আমি জানি ।
দূরত্বের টাইম দেখি না, বিলক্ষণ স্পেস দেখি ।
দূরত্বের স্টার্ট আছে, কিন্তু ফিনিশ নেই ।
স্টার্টিং পয়েন্টেও সে কিন্তু দূরত্ব নয় ।
কখন যে সে দূরত্বে যায়, কেউ জানে না, আমি জানি ।
জানি, দূরত্ব শেষ হবার নয়, সেইজন্যই সে দূরত্ব ।
যদিবা সে বাস্তবাগীশ, তাড়াহুড়োয় শেষ হতে চায়—তাহলেও
সে দূরত্ব বলেই আরও দূরে চলে যায় ।
আসলে দূরত্ব মানে, ডিসট্যান্স, মনে রাখলেই হয় ॥

আপনি আবার এ-সব পদ্য নিজের লেখায় ব্যবহার করবেন না। আমার কবিতা বহুকাল ধরেই অন্যলোকের ব্যবহারে লাগছে। এই দেখুন, আমি লিখেছিলাম,

Wishing is dreaming
Dreaming is having
Having dreaming
Dreaming die.

কডওয়েল সাহেব হুবহু এটা চুরি করে নিয়েছেন ।

আমার এপিটাফও চুরি করে নিয়ে গেছেন । দেখবেন ?

দেখুন :

Unhappy men, who roam, on hope deferred
Relying thinking not of painful death.
Here was *I*, great in mind and word
Who his young Prime enjoyed but for a breath
In world-edge *Lumbini Park*, so far from Lesbian-lands.
I lie a stranger on uncharted strands.

দেখুন, উনি কেবল আমার '*I*' কেটে নিয়েছেন । কডওয়েল খুলে দেখবেন, আমাকে, আমার '**আমি**' কে, ভাবুন একবার, আমার '**আমি**' '*I*', *Lumbini* Park সব কেটে দিয়েছেন ॥

ফলে এক উপত্যকায়, আনাড়ী আমি, অটোর পাইলট আসনে বসে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। আর থামাতে পারলাম না। থামাতে জানি না আমি। ব্রেক জানি না। দেখি, ঋত্বিক ঘটক কেবল হাসছেন। মদ ছুঁড়ে আবছা করছেন মুভি ক্যামেরার লেন্স ॥*

* পাঠক, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। এই লেখায় আমি রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিনয় মজুমদার, জঁা জেনে, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, সুমন চট্টোপাধ্যায়ের কত-না-কত পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছি। আমার অজান্তে অনেকানেক কবিদের ভাষা, হয়তবা, আছে এই লেখায়।

THESIS ON MARX
Or a critical criticism of the idealism of Marx and the Marxists

☐ The chief defect of all hitherto existing materialism—that of Karl Marx and the Marxists included—is that they have conceived of "revolutionary", "practical critical" activity as only political/ideological activity without grasping the significance of "revolutionary", "practical-critical" activity directly in the realm of the processes of human material existence. Truly revolutionary political thought and action can arise, become possible, real and material only when it arises from truly revolutionary attempts to change the conditions of material existence—the relations of "production and reproduction of immediate life". The tragic irony of Marx and Marxists is that though they realised that the production and reproduction of immediate life constituted the "determining moments of history" or the structural aspect of social orders, yet in practice they attempted only political or superstructural change without directly trying to change the structural social relations.

☐ The relations of production and reproduction of immediate life do not exist in society in a generalised, vague, society-wide way but appear concretely, materially in the relations that obtain in specific social organisations for carrying out the tasks of production and reproduction of immediate life. While Marx and Marxists recognise the social organisations which carry out the task of reproduction of life—*the family (or in the light of modern social reality, more accurately the household)*—they failed to realise that even production is carried out by specific social organisations based on social cooperation among specific individuals to carry out production which for convenience we may call *firms*. This failure to recognise the concrete, material social organisations which give concrete, material shape to relations of production and reproduction hid from them a clear conception of how relations of production (ROP) and reproduction (RORP) change in history, how first new

firms and households based on new ROP and RORP respectively appear on the historical proscenium and how as these new firms and households proliferate, they create new social and political forces. It is only then that political changes begin to take place. Never ever in history has political change succeeded in bringing about firms and households with new structural ROP and RORP but it has always been the way around. The tragedy of the Marxist is that they have tried to first bring about political change in the hope that later they may be able to create firms and households with new structural ROP and RORP. A hope which they should have known was sure to be belied as they were already aware that structural change precedes superstructural (political) change. In practice they contradicted their own theory.

☐ Political activity which is confined to making attacks against only the political superstructure of any social status quo (the state machinery) and irrespective of whether these attacks are armed or unarmed, parliamentary or extra-parliamentary, overground or underground or a combination of all these, remains essentially non-revolutionary and even when it appears to have achieved success (as in all previous socialist revolutions) in reality fails to break the structural status quo. It is then only a matter of time before the essentially intact status quo explodes the myth of apparent political change and returns with great vengeance (as has happened in all so-called socialist countries, Soviet Russia and China included). Truly revolutionary activity aims at breaking the status quo right from the very beginning by creating new collectively owned communist firms based on direct consumption of production rather than a wage system (thus changing the ROP) and new collective/communist households based on group marriage (thus changing the RORP). It is only in the process of bringing about these structural changes that truly revolutionary political and other superstructural needs arise and truly revolutionary political activity become possible. As a result of failing to understand this, the ironic tragedy of Marx and the Marxists have been that the more revo-

lutionary they have tried to be politically the less revolutionary they have actually been in practice in terms of bringing about structural change in society.

☐ The tragic irony of all hitherto Marxists, including Marx himself, is that they have all along realised that the breakdown of all class-riven exploitative social orders and their transition to class-less, egalitarian, non-exploitative social order implies the withering away and final abolition of the state machinery and yet in practice they have contradicted their own theory and have all along advocated state ownership of the means of production—something which if established would make it practically impossible for the state to wither away and get abolished. On the contrary, state ownership can survive only so long as it intervenes in the life of the people in an extremely pervasive and fascist way. For the people, the fascism of state ownership is worse than the fascism inherent in bourgeosie democracy. Genuine class-less, egalitarian, non-exploitative social orders can be hoped to be created only when collective households based on group marriage collectively own and operate production units (firms). Each such collective firm household combination can then become a self-governing, truly democratic state in itself. The state as we know it withers away and instead there remains only the need to build exchange and cooperation relations among the collective household-firm combinations to bring the entire world (the people as well as the means of production) effectively under the control of the whole people without there being any need for a separate fascist state machinery which sits on the shoulders of the people in an oppressive way.

☐ The main task of any social superstructure (the state machinery, legal framework, cultural and ideological patterns) is to maintain the social structural status quo. Hence, the weaker the structure of any social order becomes as a result of inner contradictions, the stronger that society tries to make its superstructure. Thus we find today that world capitalism is weak and is increasingly becoming weaker everyday structurally—its economy (or firms based on

capitalist/precapitalist ROPs) is constantly facing the threat of being wiped out by recession or depression while in the realm of the family the more developed a capitalist country is the higher is the rate of divorce (or the rate of breakdown of the family) in that country. But superstructurally the world capitalist state is the strongest ever and is increasingly becoming stronger under the leadership of the American military machine and not only does it threaten to wipe out any political activity aimed at breaking the status quo but it also has the strength to do so. The tragedy of all hitherto Marxists has been their total failure to understand this primary military issue—the true dispensation of the enemy's forces. As a result they have all along chosen to attack the enemy where he is strong (the state machinery) without attacking where he is weak (the economy and the family). The attempt to change the status quo by setting up collective household-firm combines which are collectively organised internally but which operate as business units externally, is not only the only scientific way to change the status quo but is also bound to succeed in changing this status quo because it adopts the correct military strategy of attacking the enemy where the concentration of forces is weak while skilfully by-passing the points where the enemy's concentration of forces is strong. Collective household-firm combinations which are organised on the basis of direct consumption of their products by their members rather than a wage system and which consciously produce a marketable surplus aimed at giving tough competition to capitalist enterprises have the inherent strength to drive more and more capitalist enterprises out of business in the market place while at the same time bring more and more means of production under the direct control of the people. If skilfully managed, these units can operate within the capitalist legal framework under the very nose of the capitalist state machinery without the state being able to do anything to stop their proliferation until these household-firm combines proliferate enough and become strong enough to directly take on the capitalist state machinery and destroy it completely.

☐ The Marxists have tried to change the world only politically, in various ways : the point, however, is to change it structurally by changing the relations of production and reproduction, i.e. by creating collective/communist firms owned and operated by collective/communist households based on group marriage. ☐